BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

ভোরবেলা পার্কে

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূতেরা সব গেল কোথায়?

বাংলার রূপকথা কিংবা উপকথার গল্পগুলি পড়লেই বোঝা যায়, এই বঙ্গভূমিতে এককালে প্রচুর সংখ্যক বাঘ ছিল। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর টুনটুনির বইতে তো বাঘের ছড়াছড়ি। বাঘ দিনদুপুরে বাড়ির উঠোনে বসে থাকে, রান্নাঘরে উঁকি মারে কিংবা রাত্তিরবেলা কম্বল চুরি করে পালায়। সেইসব বাঘ পায়েস খেতে চায়। ভয়ো হাড়ির মালা গলায় পরে। নিত্য তিরিশ দিন বাঘের দেখা না পেলে মানুষ এই রকম গল্প বানায় না। তবে বাঘগুলো নিশ্চিত নিরীহ ছিল, চাষীর ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে সেইসব বাঘের। আবার ধুরন্ধর নাপিত কিংবা জোলার হাতে জব্দ হয়েছে অনেকবার। বাঘে মানুষ খেয়েছে, উপকথার গল্পে এ-দৃষ্টান্ত প্রায় নেই বলা যায়। অর্থাৎ নিরীহ ধরনের কেদো বাঘে এক সময় বাংলার পল্লী অঞ্চল গিসগিস করত, মানুষই তাদের মেরে শেষ করেছে।

এখন বাঘের বংশই শেষ হতে বসেছে। আগে বাঘের ভয়ে মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত, এখন আবার বাঘের বংশনাশের ভয়ে মানুষ উদ্বিগ্ন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে সারা পৃথিবীব্যাপী একটি 'ব্যাঘ্র বাঁচাও' আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। ইউনেস্কো থেকে দয়ালু সাহেব-মেমরা পর্যন্ত ছুটে আসছেন ভারতীয় বাঘদের বাঁচাতে। সারা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নটা না এগারোটা ব্যাঘ্র প্রকল্প। সুন্দরবনের দুর্দান্ত বাঘরাও এখন মানুষের দয়ার ওপর নির্ভরশীল।

যাই হোক মনে তো হচ্ছে, বাঘরা আরও কিছুকাল বেঁচে গেল। ডোডো পাখিদের মতন শুধু ছবির পাতায় স্থান নিতে তাদের আরও একটু দেরি আছে। কিন্তু ভূতদের কি হবে?

এই তো কিছুদিন আগে পর্যন্ত শহরে-গ্রামে অসংখ্য ভূত ছিল। উপকারী ভূত, হিংসুটে ভূত, ভয়-দেখানো ভূত, ভয়-পাওয়া ভূত, খোকা ভূত, লোভী ভূত, ব্রহ্মদত্যি, শাকচুন্নী, পেত্নী, মামদো ভূত—কত রকম যে তার আর ইয়ত্তা নেই। উলঙ্গ আদিবাসীদের মতনই, পৃথিবীর ভূতরাও যে অতি দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অথচ সে সম্পর্কে কারুর কোনো মাথাব্যথা নেই—এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা। কেন 'ভূত-বাঁচাও' প্রকল্প রচিত হবে না? ভূতরা বাঘদের চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর?

পৃথিবী থেকে বাঘ শেষ হয়ে গেলে, আমার মতে প্রধান ক্ষতি হবে এই, বাঘ শিকারের রোমাঞ্চকর গল্প আর লেখা হবে না। অবশ্য, ব্যাঘ্র প্রকল্প রচনা হওয়ায় এখন থেকেই কেউ আর প্রকাশ্যে বাঘ শিকারের কথা জানাতে সাহস করবেন না! তেমনি, ভূতগুলো সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে পৃথিবীতে আর ভূতের গল্প লেখা হবে না। এটা ভেবে আমি এখন থেকেই দুঃখিত বোধ করছি। সাহিত্যের এই চমৎকার শাখাটি বন্ধ হয়ে যাবে! এর মধ্যেই ভূতের গল্প অনেক কম লেখা হতে শুরু হয়েছে, যা লেখা হচ্ছে তাও বেশ ফিকে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া কি এসব লেখা যায়?

অনেকে ভগবানে বিশ্বাস করে না, কিন্তু ভূতে বিশ্বাস করে। আবার এমন মানুষও দেখেছি, যারা দিনের বেলা ভূত বিশ্বাস করে না বটে, কিন্তু রাত্তিরবেলা তাদের মতামত তেমন জোরালো থাকে না। যুক্তি বা তর্কে ভগবান বা ভূত কারুরই অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। ভগবানেব দর্শন মেলে ভক্তিতে, ভূতকে মেলে ভয়ে। এবং যেহেতু ভক্তির চেয়ে ভয়ের প্রাবল্য অনেক ব্যাপক, সেই জন্যই ভূতের দর্শন পেয়েছে অনেক বেশি মানুষ। ভয়-পাওয়াটা সব সময় মোটেই খারাপ জিনিস নয়। ছমছমে ভয়ে বেশ একটা মিষ্টি স্বাদ পাওয়া যায়, রক্ত-চলাচল হয় দ্রুত, বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ আওয়াজ, পেছন দিকে তাকাতেও সংশয়—যে এর স্বাদ পায়নি, সে এর মর্ম বুঝবে কি!

ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ করার একটা অপ্রত্যক্ষ উপায়ও আছে। খ্রিষ্টান মতে, যীশুখ্রিষ্টের শরণ যে নেয় না, তার স্বর্গে স্থান নেই। অর্থাৎ যীশুখ্রিষ্টের জন্মের আগে হাজার হাজার বছর ধবে যেসব মানুষ মরেছে, তারা কেউ স্বর্গে যেতে পারেনি, তারা লিমবো নামে একটা জায়গায় রয়েছে! এই লিমবোকে একটি সুবৃহৎ ভূত কলোনী ছাড়া আর কি বলা যায়। ইসলামী শাস্ত্রেও আছে মানুষেব মৃত্যুর পর স্বর্গের ফেরেস্তা তার রূহ কবজ করতে আসেন। এখানেও আছে পুণ্যাত্মাব জন্য স্বর্গ, পাপীদের জন্য নরক। হিন্দুধর্মেও আছে স্বর্গ-নরক। পুণ্যাত্মাদের থেকে পাপীদের সংখ্যা যে চিরকালই বেশি, এ বিষয়ে আশা করি, কারুর কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। সেই হিসেবে, স্বর্গে এখনো পপুলেশন এক্সপ্লোশান না হলেও নরকে এই তিন ধর্মের এত কোটি কোটি লোকের জায়গা হওয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার না? নরক ঠেলে তাবা পৃথিবীতে তো আসতেই পাবে। এই তিন ধর্মের বিশ্বাস, মানুষের মৃত্যুর পরেও তার আত্মা নামে একটা ব্যাপার থাকে এবং সেই বস্তুটি অবিনাশী। এত আত্মার ঠাঁই হচ্ছে কোথায়। হিন্দু ছাড়া আর কেউ পুনর্জন্ম মানে না। তবে, পুনর্জন্মের মাঝখানে কিছুদিন অনেক আত্মা বেলগাছে বা অশত্থগাছের মগডালে বসে কিছুদিন ভূতগিরি করে যায়। আবার এক শ্রেণীর

হিন্দুর ধারণা গয়ায় পিণ্ডি না দিলে কোনো আত্মারই মুক্তি নেই। সুতরাং যতদিন পিণ্ডি দেওয়া না হচ্ছে কিংবা যাদের দেওয়াই হচ্ছে না, তাদের তো ভূত হয়ে থাকার ন্যায্য অধিকার আছেই।

তা ছাড়া ভূতের অস্তিত্ব একেবারে প্রমাণ করে দিয়েছেন স্বর্গত পরশুরাম তাঁর বিখ্যাত গল্প মহেশের মহাযাত্রায়। যেখানে অবিশ্বাসী মহেশ তার মৃত্যুর পর গঙ্গাযাত্রার সময়ে খাটিয়ার ওপর দাঁড়িয়ে নাচতে নাচতে বলেছিল, আছে, আছে, সব আছে।

আমরা অবশ্য সাহেব ভূত, ব্রহ্মদৈত্য (ব্রাহ্মণ ভূত) বা মামদো ভূত (মুসলমান ভূত)-এর প্রচুর সত্যি গল্প শুনেছি। আমি অবশ্য নিজের চোখে কোনো ভূত দেখার সৌভাগ্য লাভ করতে পারিনি এ পর্যন্ত, কিন্তু ছেলেবেলায় ভূতুড়ে বাড়ি দেখেছি প্রচুর।

বেশি দিনের কথা নয়, মাত্র কুড়ি পঁচিশ বছর আগেও কলকাতায় প্রচুর ভূতুড়ে বাড়ি ছিল। শৈশবকালে আমরা উত্তর কলকাতায় যে বাড়িতে ভাড়া ছিলাম, সেই বাড়ির ছাতেই রাত্তিরবেলা ওঠা ছিল বারণ। মাঝরাত্রে সে বাড়ির ছাদে দুমদুম শব্দ হতো। সেই বাড়ির একটি বিবাহিতা মেয়ে আত্মহত্যা করেছিল কয়েক বছর আগে। সে মাঝে মাঝে চিলছাতে এসে পা ঝুলিয়ে বসে থাকত। কতজন তাকে দেখে মূর্ছা গেছে। মৃত্যুর আগে মেয়েটি খুব রূপসী ছিল, স্বামীর অত্যাচারে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল বলেই বোধহয় তার গলাটা খুব লম্বা হয়ে যায়—চিলছাতে বসেই সে এক-একদিন মুখ ঝুঁকিয়ে এনেছে সিঁড়ির কাছে।

সে বাড়িতে আমাদের বেশি দিন থাকা হয়নি। এর পরে যে পাড়ায় উঠে গিয়েছিলাম সে পাড়ায় একটি অতি জমকালো ভূতের বাড়ি ছিল। বিরাট তিনতলা বাড়ি, সামনে বাগান, কিন্তু সেখানে দিনের বেলাতেও কেউ ঢুকত না। বিশেষ বিশেষ রাত্রে সেই অন্ধকার ভূতুড়ে বাড়ির তিনতলার ঘরগুলো থেকে বিশ্রী আওয়াজ ভেসে আসত, ঝপাঝপ করে খুলে যেত জানলা-দরজা, আলো জ্বলত আর নিভত। আর কাঁচা মাংস ও হাড় সেই বাড়ি থেকে ভূতেরা ছুঁড়ে ফেলত চতুর্দিকে। মালিক সেই বাড়ি বিক্রির অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিক্রি তো দূরের কথা, সে বাড়ি ভাড়াও হয়নি কোনো দিন। কালীসাধক অসমসাহসী গগনবাবু একদিন সে বাড়িতে রাত কাটাতে গিয়েছিলেন, শেষ রাত্রে তিনি বাপরে মারে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে আসেন। তাঁর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে রক্ত পড়ছে। একটি পেত্নী নাকি সুন্দরী মেয়ে সেজে এসে তাঁর পায়ের আঙুল কামড়ে ধরেছিল। একেবারে কচ্ছপের মতন কামড়, মাংস তুলে নিয়েছে।

তারপর দেখেছি আমাদের স্কুলের বিপিনবাবু স্যারকে। তাঁর সারা গায়ে ছিল

ফালা-ফালা দাগ। একদিন জামা খুলে দেখিয়েছিলেন আমাদের। কাহিনীও শুনেছিলাম। ছেলেবেলায়, বিপিনবাবু স্যারের নাম যখন বিপিন, বোর্ডিং-এ থেকে পড়তেন, সেই সময় বোর্ডিং-এর একটি ছাত্র অজয়ের সঙ্গে তাঁর খুব ঝগড়া হয়। বিপিনের খুব গায়ে জোর, সে মারধোর দেয় অজয়কে। হেরে-যাওয়া অজয় শাসিয়েছিল, আচ্ছা দেখিস, একদিন ঠিক শোধ নেবো।

কয়েক মাস বাদে গরমের ছুটিতে অনেক ছেলেই বোর্ডিং ছেড়ে বাড়ি চলে গেছে। যাদের যাবার জায়গা নেই কোথাও, তারাই থেকে গেছে, সেইরকম চারজনের মধ্যে রয়েছে অজয় আর বিপিন। হঠাৎ এক রাত্রির কলেরায় মারা গেল অজয়। দারুণ বৃষ্টি-বাদল দুর্যোগ, কিন্তু ব্রাহ্মণের মড়া বাসি করতে নেই বলে অন্য তিন বন্ধু নিয়ে গেল তাকে পোড়াতে। গ্রামের শ্মশান, বৃষ্টির দিনে একেবারে ফাঁকা। কাঠ-ফাটি যোগাড় করে চিতা জ্বালাতে গিয়ে দেখা গেল কেউ দেশলাই আনেনি। তিন মাইল দূর থেকে দেশলাই আনতে হবে--কেউ একা থাকতে চায় না। কেউ একা যেতে চায় না। শেষ পর্যন্ত অসমসাহসী বিপিন একাই বসে রইল মড়া ছুঁয়ে।

অন্য বন্ধুরা একটু দূরে যাওয়া মাত্রই পটপট করে দড়ি ছিঁড়ে উঠে বসল অজয়। এখন তার গায়ে দারুণ শক্তি। সে হিংস্রভাবে বলল, তবে রে বিপিন! বিপিন তাকে জোর করে চেপে ধরে রইল, আর অজয়ের মড়া ধারালো নখ দিয়ে চিরে দিতে লাগল তার সারা গা। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল ঘাড়...

এই কাহিনী শোনার পর বিপিন স্যারকে দেখলেই ভয় পেতাম আমরা। ভূতের সঙ্গে যে যুদ্ধ করেছে, তাকে দেখলেও ঠিক যেন বীর মনে হয় না।

এরকম গল্প ছড়ানো ছিল অজস্র। কলকাতায় বহু বড়ো বাড়িতে ছিল এরকম ভূতের আড্ডা। শহরতলি, এমনকি প্রত্যেক গ্রামেই একটা-না-একটা ভূতুড়ে বাড়ি ছিল। কত অন্ধকার জলসাঘর রাত দুপুরে আলোয় ঝলমল করে উঠত, শোনা যেত বাঈজীদের পায়ের আওয়াজ, কত অতৃপ্ত জমিদারের মৃত আত্মা আবার মদ্যপান করতে আসত সেখানে। কত কলাগাছের পাশে ঘোমটা পরা সুন্দরীর সাজে দাঁড়িয়ে থাকত পেত্নীরা। কত বেলগাছের ডালে বিশাল স্তনমণ্ডিতা শাকচুন্নীরা বসে বসে পা দোলাত। আর প্রতি অমাবস্যায় রাত্রে তুফান মেল এলেই একটি নির্দিষ্ট স্থানে বারবার আত্মহত্যা করতে ছুটে যেত এক নির্যাতিতা বধূ।

তখন কলকাতায় যেমন ছিল 'টু লেট' ঝোলানো বাড়ি, সেই রকমই ছিল বহু ভূতের বাড়ি। গত শতাব্দীতে একটি বাড়ির মালিকানার প্রশ্নে ভূতের বিরুদ্ধে মামলা পর্যন্ত উঠেছিল হাইকোর্টে। একবার ভূতুড়ে নাম রটে গেলে, সে বাড়ি জলের দামেও বিক্রি হতো না।

একটা মোটামুটি হিসেব এখানে জানাচ্ছি। উনিশশো আঠারো সালে

কলকাতায় খালি বাড়ির সংখ্যা ছিল ৩২৫টি, তার মধ্যে ভূতের বাড়ি নব্বইটি, ১৯৩০ সালে খালি বাড়ি ২৪৪টি, ভূতের বাড়ি পঁচানব্বই, ১৯৪১ সালে খালি বাড়ি ১৪০০০, ভূতের বাড়ি ছিল দুশো বাইশ। ১৯৫৪ সালে খালি বাড়ি মাত্র ১২টি, ভূতের বাড়ি একটিও না! আচমকা যদি কেউ আমায় প্রশ্ন করেন, এই পরিসংখ্যান আমি পেলাম কোথায় কিংবা এই পরিসংখ্যান সত্য কিনা, তবে তাঁদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, মিথ্যা তিনরকম, লাই, ড্যাম লাই এবং স্ট্যাটিসটিকস।

অনেকের ধারণা, বিজলি বাতিই বুঝি ভূতদের তাড়িয়েছে। এ ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। কলকাতা শহরে ভূতদের বাস্তুহারা করেছে পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারারা। এই রিফিউজিরাই পিলপিল করে এসে এখানে একটাও বাড়ি খালি রাখেনি, ভূতের বাড়ি গ্রাহ্য করেনি, খালি বাড়ি দেখলেই জবরদখল করেছে। বিখ্যাত ভূতুড়ে বাড়িগুলো এখন বাঙাল ভূতদের অধীনে। আমার মতন বাঙাল এবং রেফিউজিরাই যে কলকাতার বহু সমস্যার জন্য দায়ী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এরা সুন্দর কলকাতাকে নষ্ট করেছে, ভিড়ে ভিড়াক্কার করেছে, রাস্তাঘাট নোংরা করেছে। আর এই রেফিউজিদের আগমনের জন্য যারা দায়ী, ভারত ভেঙে ভাগ করেছিল যেসব বুড়ো খোকারা, তারাও কবে মরে ভূত হয়ে গেছে! এখন আর নতুন ভূত পাওয়া যাচ্ছে কোথায়!

মানুষ কোথায় কোথায় হেরে যায়

আমাদের ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি, দেবেনদা একজন প্রচণ্ড নাস্তিক। নাস্তিকতা জিনিসটা যদিও পৃথিবীতে অনেক পুরোনো তবু অনেকেই এখনো প্রকাশ্যে কোনো নাস্তিককে দেখে চমকে যায়। দেবেনদা এই জন্যই অনেকের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন। দেবেনদার লম্বা-চওড়া চেহারা, উন্নত ঘাড় এবং গমগমে কণ্ঠস্বর। নাস্তিকতার কথা তিনি সরবে ঘোষণা করতেন। তাঁকে দেখে মনে হতো একজন সাহসী লোক। যদিও নাস্তিকরাই বেশি সাহসী হবে এমন কোনো কথা নেই, সন্ন্যাসীরাও সাহসী হতে পারে। বিশ্বাস বা অবিশ্বাস—যে কোনো গোঁড়ামিই মানুষকে একরোখা করে দেয়।

যাই হোক, অবিশ্বাসকে অবলম্বন করেই, দেবেনদা সুখী ছিলেন। তিনি ভূত বা ভগবান, যাগ-যজ্ঞ, পুজো-মানত, হোমিওপ্যাথি ওষুধ, তেরো নম্বর সংখ্যা ইত্যাদি সব কিছুকেই কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতেন।

দেবেনদার সঙ্গে বিয়ে হয় সুলেখাদির।

যথাসময়ে ওঁদের একটি ছেলে হলো। কি সুন্দর ফুটফুটে ছেলে। তার নাম রাখার জন্য রামায়ণ, মহাভারত আর দু' তিনখানা অভিধান উল্টেপাল্টে দেখা হলো অনেকবার। কোনো নামই পছন্দ হয় না। দেবেনদার কড়া হুকুম, ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো নামই রাখা চলবে না। আমরা অবশ্য ওকে রাজকুমার বলে ডাকতে আরম্ভ করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত সেই নামটাই থেকে গেল।

সাড়ে তিন বছর বয়েসে রাজকুমার দোতলা থেকে একতলায় পড়ে গেল এক দুপুরে। হাত-পা কিছুই ভাঙেনি মনে হয়, রক্তটক্তও বিশেষ বেরোয়নি, কিছুক্ষণের জন্য গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। একটা ইঞ্জেকশানের পরই ছেলে ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। ডাক্তার বললেন, এ ছেলেকে ভগবান বাঁচিয়েছে।

এর ক'দিন পর থেকেই রাজকুমারের হাত-পায়ে খিঁচুনির মতন শুরু হয়। ঠিক যেন মৃগী রোগ। হঠাৎ হঠাৎ হাত পা থরথর করে কাঁপে, তখন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, শুয়ে পড়ে।

এক বছর পরে দেখা গেল রাজকুমারের এই অসুখ দুরারোগ্য। সব ডাক্তারই হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

ছেলের চিকিৎসার জন্য তুলকালাম কাণ্ড করেছিলেন দেবেনদা। তাঁর পিতৃ-হৃদয় এক প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল, যে-কোনো উপায়ে ছেলেকে সুস্থ করে তুলতেই হবে। মাদ্রাজ পর্যন্ত ঘুরে এলেন ছেলেকে নিয়ে। কিছুতেই কিছু হলো না। তখন ঠিক করলেন আমেরিকা যাবেন। দেবেনদার অত টাকার সঙ্গতি নেই। ক্রীতদাসের মতন পরিশ্রম করে দেবেনদা টাকা রোজগার করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যেই আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা নানারকম টোটকার পরামর্শ দিচ্ছিলেন। তারপরই এসে যায় সাধু-ফকিরদের কথা। মাঝে মাঝেই দু'একজন সাধু বা ফকিরের নামে খুব জোর গুজব ওঠে যে তারা ধন্বন্তরি, যে-কোনো অসুখ সারিয়ে দিতে পারেন। বারুইপুরের সেই রকম এক সাধুর নাম তখন খুব চলছিল।

এক আত্মীয়ের সঙ্গে সুলেখাদি একদিন গেলেন সেই সাধুর কাছে। সাধু সুলেখাদিকে দেখেই বললেন, কি, ছেলের জন্য চিন্তা করছিস তো? সব ঠিক হয়ে যাবে।

সাধুর দেওয়া ওষুধে সত্যিই নাকি খানিকটা উপকার হলো রাজকুমারের। একটা সাড়া পড়ে গেল আত্মীয় মহলে। দেবেনদা সব শুনে ঠোঁট বেঁকালেন। আত্মীয়রা খবর আনল, সাধু বলেছেন, একদিন বাড়িতে এসে যজ্ঞ করলেই ছেলে পুরোপুরি সেরে যাবে। দেবেনদার কোনো মতামত না নিয়েই ডেকে আনা হলো

সাধুকে। বারান্দায় যজ্ঞের আগুন জ্বালিয়ে সাধু বললেন, ছেলের বাবা কোথায়? তাকেই এসে মন্ত্র পড়তে হবে।

দেবেনদা গুম হয়ে বসে ছিলেন অন্য এক ঘরে। সুলেখাদি সেখানে গিয়ে সজল চোখে বললেন, আমার মাথার দিব্যি, তুমি আপত্তি করো না। একবারটি গিয়ে বসো, ছেলের কথা ভেবে, আমার কথা ভেবে—

দেবেনদা আর কি করবেন? যে-কোনো উপায়েই হোক, পুত্রের রোগ-মুক্তি কোন পিতা না চায়? কিংবা মায়ের প্রাণ যদি এতে সান্ত্বনা পায়, সেটাও তো কম কথা নয়। স্নান সেরে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে দেবেনদা গিয়ে বসলেন সেই সন্ন্যাসীর সামনে। যজ্ঞের আগুন জ্বালানো হয়েছে, তার মধ্যে চটপট করে পুড়ছে খাঁটি টিনের ঘি। সন্ন্যাসী দেবেনদার হাতে শালগ্রাম শিলা তুলে দিয়ে নানারকম শক্ত শক্ত মন্ত্র পড়াতে লাগলেন, আমরা চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি। এক সময় দেখলাম, দেবেনদার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে।

ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা তো করতেই পারে। প্রিয়তম পুত্রের বিপদের কথা মনে করেও আসতে পারে কান্না, অদূরেই রোরুদ্যমানা সুলেখাদি বসে ছিলেন ছেলে কোলে নিয়ে। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছিল, দেবেনদার চোখের জল পড়ছে পরাজয়ের গ্লানির জন্য। তিনি সংস্কারের কাছে হেরে গেলেন।

রাজকুমার আর মাত্র এক বছর বেঁচেছিল। তারপর থেকেই দেবেনদা ঘোরতর ধর্মে নিষ্ঠাবান মানুষ। তাঁর ধারণা হয়েছিল অবিশ্বাসী মন নিয়ে তিনি পূজায় বসেছিলেন বলেই ঠিক মতন ফল হয়নি।

এই ঘটনাটা একটু সবিস্তারে বললাম, কারণ এটা আমার নিজের চোখে দেখা এবং ছেলেবেলায় আমার মনে খুব দাগ কেটেছিল। আমরা এর পুরো তাৎপর্য তখন বুঝতে পারিনি।

পৃথিবীতে সব মানুষের না হোক, বহু সংখ্যক মানুষেরই কিছু-না-কিছু আদর্শ থাকে। তা সরব হোক বা নীরব হোক। কিন্তু খুব কমসংখ্যক মানুষই সেই আদর্শকে টিকিয়ে রাখতে পারে সারা জীবন। রাস্তায় ঘাটে, সভাসমিতিতে সব সময়ই দেখা যায় এরকম নীরব বিষণ্ণ হেরে যাওয়া মানুষের মুখ। আয়নাতেও আমি এরকম একটি মুখ দেখতে পাই।

মানুষ এভারেস্টের শীর্ষে উঠেছে, চাঁদে গেছে, আরও দূরে যাবে, কিন্তু এখনো সংস্কার, ঈর্ষা, লোভ—ইত্যাদি যে জিনিসগুলিকে সে মনে মনে জানে অন্যায় বা ভুল, তবু তার কাছে বশ্যতা মানে।

অতিকায় সমস্ত প্রাণীকে নিশ্চিহ্ন করে মানুষ এই পৃথিবীতে আধিপত্য স্থাপন করেছে বুদ্ধির জোরে। তবু শারীরিক শক্তির প্রতাপ অনেক বেশি। আপনি যত

বড়োই পণ্ডিত বা আদর্শবাদী হোন না কেন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটি বিশাল চেহারার লোক যদি ধমকে বলে, 'চোপ মশাই'—তা হলে আপনার আর কিছু করার নেই।

পৃথিবীর ভাগ্য এখন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আণবিক ও পারমাণবিক অস্ত্রে, কিন্তু এখনো সামান্য একটা ছুরি আপনার ব্যক্তিত্ব কেড়ে নিতে পারে। প্রকাশ্য রাস্তায় একটি গুণ্ডা শুধু ছুরি উঁচিয়ে একটি বাচ্চা মেয়ের গলা থেকে সোনার হার কেড়ে নিচ্ছে, দর্শকরা সবাই নিশ্চুপ। বস্তুত একজন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার গলা থেকে সোনার হার ছিনিয়ে নেওয়ার চেয়ে একটি শিশুর খেলনা কেড়ে নেওয়ার দৃশ্য আমাদের কাছে বেশি মর্মান্তিক। সেখানে উপস্থিত থেকেও আমরা যদি বাধা দিতে না পারি, মানুষ হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই একটু ছোট হয়ে যাই। আমাদের মুখে একটা মেঘলা ছায়া পড়ে। সেখানে যারা উপস্থিত থাকে না, তারা এই ঘটনা শুনে বলে, ইস, এতগুলো মানুষ ছিল, সবাই মিলে বাধা দিতে পারল না? গ্রামের লোক কখনো সদলবলে ডাকাতদের তাড়া করে বটে, কিন্তু শহরের লোক কখনো সঙ্ঘবদ্ধ হয় না। ভিড়ের মধ্যে আলাদা থাকাই শহরের মানুষের স্বভাব।

অসুখ এবং স্ত্রী, এই দুটি ব্যাপার যে কত মানুষকে হারিয়ে দেয়, তার আর ইয়ত্তা নেই। ক্যানসার, অ্যাটম বোমা এবং জাঁদরেল স্ত্রীর কোনো প্রতিষেধক এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি বটে, কিন্তু অনেক সাধারণ অসুখ কিংবা নরম স্ত্রীর পাল্লায় পড়ে অনেক উন্নতমনা পুরুষ হঠাৎ কি রকম বদলে যায় কেন?

জীবিকার ক্ষেত্রে, চাকরি বা ব্যাবসা যাই হোক, মানুষকে অনেক কিছু মেনে নিতে হয়।

আমি একজন মানুষকে চিনতাম, যিনি মনে করতেন ঘুষ নেওয়া একটা অন্যায় কাজ। এই ধরনের অদ্ভুত ধারণা এখনো কারুর কারুর আছে। প্রকৃতি এঁকে নিয়ে একটু পরিহাস করার লোভ সামলাতে পারেননি। এঁকে এমন একটি অফিসে চাকরি যোগাড় করে দিয়েছিলেন, যে অফিসে প্রত্যেকের পক্ষে ঘুষ নেওয়া বাধ্যতামূলক। আশ্চর্য হবার কিছু নেই, এরকম অফিস শুধু আমাদের দেশে কেন, পৃথিবীর অনেক দেশেই আছে। যেহেতু আমিও হেরে-যাওয়া মানুষ, তাই অফিসটির নাম করতে পারছি না। নাম করলেই সেখানকার বহু কর্মচারী নিজেদের সততার অকাট্য প্রমাণ দিয়ে আমাকে শাসাবে। যাই হোক, ঘটনাটা এই।

ঘুষের অনেক রকম নাম আছে। আদালতের পেশকারকে লোকে রায়ের কপি আনবার জন্য যেটা দেয়, সেটা কি? বাড়িওয়ালাকে নতুন ভাড়াটে কি দেয়? এই অফিসে ঘুষের নাম ছিল পার্সেনটেজ। মিলিটারি সাপ্লাইয়ের বড়ো বড়ো বিল পাস করে দিলেই কন্ট্রাকটাররা পাঁচ বা সাড়ে সাত পার্সেন্ট কর্মচারীদের দিয়ে যেতেন চা মিষ্টি খেতে। এক লাখ টাকার সাড়ে সাত পার্সেন্ট সাড়ে সাত হাজার টাকা।

বিয়ে বাড়িতেও লোকে এত টাকার মিষ্টি খায় না। দশ-পনেরো লাখ টাকার পার্সেন্টেজ আপনারা হিসেব করে নিন। এই টাকা বিভিন্ন কর্মচারীর পদমর্যাদা অনুযায়ী ভাগ করে খামে পুরে টেবিলে টেবিলে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এটা সকল কর্মচারীর সাম্য-মনোভাবের জন্য নয়। যাতে কেউ কিছু ফাঁস করে দিতে না পারে কিংবা নিজেদের নির্দোষ না ভাবতে পারে। আমাদের পরিচিত প্রতাপবাবু তবু এটাকে দোষ ভেবে ফেললেন। তখন তাঁকে বদলি করা হতে লাগল বিভিন্ন শাখা অফিসে। প্রত্যেক জায়গা থেকেই তাকে অপদার্থ বলে ফেরত পাঠানো হয়। তিনি অন্য চাকরির চেষ্টা করেছেন, পাননি। তিনি মাসের পর মাস ছুটি নিয়েছেন, আত্মীয়স্বজন গঞ্জনা দিয়েছে তাঁকে। তারপর উড়ো চিঠিতে জানান হলো, তাঁকে খুন করা হবে। ব্যস, সুযোগ এসে গেল, প্রতাপবাবু পাগল হয়ে গেলেন। চিকিৎসা চলল ছ'মাস, ছেলেমেয়েরা খেতে পায় না। আধপাগলা অবস্থাতেই তাঁকে ফেরত নেওয়া হলো অফিসে। এখন সবাই খুশি। তাঁকে কোনো কাজ করতে হয় না, তবু মাইনে ও উপরি ঠিক পেয়ে যান, একজন সহকর্মী সে টাকা নিজে ওঁর বাড়িতে এসে স্ত্রীর হাতে দিয়ে যান।

পরাজয় ভুলে থাকার জন্য পাগল হয়ে যাওয়া সবচেয়ে সহজ উপায়। আমার এক-এক সময় মনে হয়, উনি বোধহয় ঠিক পাগল নন, সুবিধে মতন পাগল সেজে আছেন। এক-একদিন দেখতে পাই উনি বড়ো রাস্তার মোড়ে একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। কেউ কথা বললেও উত্তর দেন না। ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। কি অদ্ভুত বিষণ্ন চোখ। আসল পাগল বা সেজে-থাকা পাগল যাই হোক, এরকম দুঃখিত মানুষ আমি বহুদিন দেখিনি।

গল্পের গোয়েন্দা ও বাস্তব গোয়েন্দা

ডিটেকটিভ গল্প বা পূর্ণাঙ্গ রহস্যকাহিনী শুরু হলো কবে থেকে? মারিও প্রাটজ নামে একজন নাম-করা সমালোচক, দুমদাম কথা বলা যার স্বভাব, বেশ জোর দিয়েই বলেছেন যে, মিলটনের প্যারাডাইজ লস্ট'ই আজকের সমস্ত গোয়েন্দা গল্পের উৎস। মিলটন যেমন তার কাব্যে শয়তানকে করেছেন প্রধান চরিত্র, তেমনই, তারপর থেকে বহু বইতে ডাকাত বা খুনীরা প্রাধান্য পেতে লাগল। কথাসরিৎসাগর, জাতক বা তারও আগেকার কোনো কাব্য বা পুরাণে ছোটখাটো রহস্য সমাধানের কাহিনী থাকতে পারে—কিন্তু অপরাধী চরিত্রটির ওপর এত জোর দেওয়া হয়নি কখনো।

অবশ্য এখন রহস্যকাহিনীর প্রধান আকর্ষণ গোয়েন্দা নিজেই। পাকা লেখকদের হাতে এই গোয়েন্দা চরিত্র এমন জীবন্ত হয়ে ওঠে যে, পাঠকের ধারণা হয়, সত্যিই বুঝি রক্তমাংসের এরকম একজন মানুষ আছে। কোনান ডয়াল যখন একটি কাহিনীতে শার্লক হোমসের মৃত্যু ঘোষণা করেছিলেন, তখন নাকি লণ্ডনবাসীরা শোক জানাবার জন্য কালো পোশাক পরেছিল। ডিটেকটিভদের মরতে নেই। তাদের কানের পাশ দিয়ে সব সময় গুলি বেরিয়ে যাওয়াই নিয়ম।

ছেলেবেলায় আমার ধারণা ছিল, টালিগঞ্জের একটি 'প্রাসাদোপম' অট্টালিকায় সত্যিই কিরীটি রায় নামে একজন মানুষ থাকে, যার চাকরের নাম জংলি। এমনকি, 'রোমাঞ্চ' সিরিজের একদা নায়ক প্রতুল লাহিড়ী হরি ঘোষ স্ট্রিটের একটি দোকান মিষ্টি খেতে যান—এই মর্মে বিজ্ঞাপন দেখে আমি সত্যিই একদিন সেই দোকানে মিষ্টি কিনতে গিয়েছিলুম। এবং মনে মনে সংকল্প ছিল, কখনো বিলেত গেলে বেকার রোডে মি. ব্লেক-এর কাছে গিয়ে তাঁর সিগারেট কেসটি একবার দেখে আসতেই হবে—যে সিগারেট কেসটি বুক-পকেটে থাকলে পিস্তলের গুলিও কিছু করতে পারে না।

কিছুকাল আগে, গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাৎসরিক গড়ে ইংরেজি ভাষায় সবচেয়ে বেশি বই বিক্রি হয়েছে যেসব লেখকের, তাঁদের একটি তালিকা বেরিয়েছিল 'টাইম' সাপ্তাহিকে। শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হবে, সেই তালিকার শীর্ষে ছিলেন মিকি স্পিলেন, রহস্যকাহিনীর লেখকদের মধ্যে যিনি নিকৃষ্টতম। এর থেকেই বোঝা যাবে, সারা পৃথিবী জুড়ে রহস্যকাহিনীর পাঠক কত বেশি। এমন বহু ব্যক্তি থাকে, যারা আর কোনো বই-ই পড়ে না, ডিটেকটিভ বই ছাড়া। ট্রেনে কিংবা এরোপ্লেনে যাত্রার সময় অন্য বইয়ের বদলে ডিটেকটিভ বই সঙ্গে রাখারও যেন একটা অলিখিত নিয়ম আছে।

মিকি স্পিলেন কিংবা হাল আমলের জেমস হেডলি চেজের লেখার মধ্যে অবশ্য মারামারি হুড়োহুড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই, কিন্তু নিছক বুদ্ধির চর্চার জন্য এক প্রকার অপরাধ-সাহিত্য ইতিমধ্যেই পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে, এবং এতে কলম ধরেছেন অনেক পাকা লেখক।

সুঠাম, সুদর্শন, জুজুৎসু বা ঘুসোঘুসিতে ওস্তাদ গোয়েন্দা সৃষ্টি করেন সাধারণ লেখকরা। পাকা লেখকদের গোয়েন্দারা আসে বৈশিষ্ট্য নিয়ে। প্রথম শ্রেণীর গোয়েন্দারা ডাকাত বা খুনীর পেছনে দৌড়োয়, ধস্তাধস্তি বা গুলি ছোঁড়াছুঁড়ির পর ধর্মের জয় আর অধর্মের পরাজয় হয়ে যায়। কিন্তু অবাস্তব গোয়েন্দা হিসেবে যারা অমর হয়েছে, ক্ষুরধার বুদ্ধিতে তারা মেকিয়াভেলি বা কিসিংগারকেও ছাড়িয়ে যায়। যত বুদ্ধিমান পাঠকই হোক, বইয়ের শেষ পরিচ্ছেদে আসার আগে কেউ

বুঝতে পারে না, ডিটেকটিভ কাকে সন্দেহ করছেন। রহস্যের মহারানী আগাথা ক্রিস্টির এরকুল পোয়ারো একটি ছোটখাটো চেহারার বৃদ্ধ, যার শরীরের মধ্যে গোঁফটিই প্রধান দ্রষ্টব্য। খুনীর সঙ্গে মারামারি করা তো দূরের কথা, এরকুল পোয়ারো তার কোটের আস্তিনে সামান্য ধুলো লাগলেই বিরক্ত হন। অর্থাৎ এদিক থেকে তিনি ফাদার ব্রাউনেরই উত্তরসূরী। মিস মারপলের তুলনা কিন্তু পৃথিবীতে কোথাও নেই। এক গ্রাম্য বুড়ি শুধু ঘরের মধ্যে বসে বসে যেভাবে কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান করে ফেলে, তাতে মনে হয়, আগেকার দিন হলে ওকে নিশ্চিত ডাইনি বলে পুড়িয়ে মারা হতো।

আমি ছেলেবেলা থেকেই ডিটেকটিভ বইয়ের পোকা। পাঁচকড়ি দে থেকে আর্ল স্ট্যানলি গার্ডনার—কিছুই বাদ দিই না। আমার মতে, শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ গল্প লিখেছেন ফরাসী লেখক জর্জ সিমোনোঁ--এর ডিটেকটিভকে মোটেই কোনো জমকালো নায়ক বলা চলে না। ইন্সপেকটর মেইগ্রে একজন মধ্য বয়স্ক পুলিশ অফিসার, বিবাহিত এবং এতই বাস্তবের কাছাকাছি যে মনে হয়, প্যারিসের সবাই বুঝি ওঁকে চেনে। জর্জ সিমোনোঁর লেখায় ইন্সপেকটর মেইগ্রেই প্রধান চরিত্র, খুনী বা ডাকাতরা নয়--এবং ইনি তরোয়ালের মতন ধারালো বুদ্ধিরও পরিচয় দেন না—এমনকি অনেক কাহিনীতে ইনি অপরাধীকে ধরতে ব্যর্থ হন পর্যন্ত। এই বিশাল চেহারার কোমল পুরুষটি মানুষের চোখ থেকে হৃদয় পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করেন। সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার হচ্ছে এঁর জেদ। এই জেদের জন্যই তিনি প্রত্যেকটি ব্যাপারের শেষ না দেখে ছাড়েন না। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড-প্রাপ্ত কয়েদীকে মাঝে মাঝে সান্ত্বনা জানাতে যান ইনি—আর কোনো গোয়েন্দা গল্পে এ নিদর্শন নেই।

এই ধরনের সূক্ষ্ম বুদ্ধিপ্রধান গোয়েন্দা কাহিনী রচনা হঠাৎ থেমে গেল জেমস বণ্ডের আবির্ভাবে। চালু হলো আর একটি শব্দ, ডিটেকটিভের বদলে এজেন্ট। অবশ্য ঠিক এই অর্থেই বঙ্কিমবাবু তাঁর দেবীচৌধুরানী উপন্যাসে 'গোয়েন্দা' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। জেমস বণ্ডের গল্পে সাঙ্ঘাতিক মারামারি, বুদ্ধির মারপ্যাঁচ এবং ঘন ঘন নারীবিহার—এই তিনটি জিনিস মিশে যাওয়ায় আকর্ষণ আরও বেড়েছে। এখন ০০৭-এর অনুকরণে বাজার ভর্তি।

বাংলায় ডিটেকটিভ-সাহিত্য বেশ দীন। পাঁচকড়ি দে'র পর দীনেন্দ্রকুমার রায় বহুদিন রাজত্ব করেছিলেন, যদিও সকলেই জানেন, দীনেন্দ্রকুমারের লেখাগুলি নিকৃষ্ট ইংরেজি সিরিজের অনুবাদ। তবু একটি কথা বলতেই হবে, দীনেন্দ্রকুমার তাঁর গোয়েন্দা কাহিনীগুলিতে দেশাত্মবোধক কাজ করে গেছেন। সাহেব চোর-ডাকাতদের সম্পর্কে লিখে তিনি বেশ আনন্দ পেতেন, মাঝে মাঝেই তাঁর লেখার মধ্যে বন্ধনীতে এই রকম মন্তব্য থাকত, 'দেখো, দেখো পাঠক, প্যাণ্ট কোট পরিধান

করলেই মানুষ সুসভ্য হয় না। দেখো, ইংরাজের মধ্যেও কত নরপশু রহিয়াছে।'

এরপর একমাত্র শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ই সার্থক বয়স্ক-পাঠ্য গোয়েন্দা গল্প লিখেছেন। তাঁর ব্যোমকেশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সখের গোয়েন্দাদের অন্যতম, যদিও সে নিজেকে ডিটেকটিভ না বলে সত্যান্বেষী বলে এবং তাঁর স্ত্রীর নামও সত্যবতী। অবিবাহিত অবস্থায় ব্যোমকেশকে অনায়াসেই বাঙালি শার্লক হোমস বলা যেত।

রামায়ণ লেখার পর যেমন রাম জন্মেছিলেন, তেমনি ভালো ভালো গোয়েন্দা কাহিনী লিখিত হবার পরই জন্মেছে প্রাইভেট ডিটেকটিভরা। গোয়েন্দাগিরি করে জীবিকা অর্জন করে—এমন কিছু কিছু মানুষ সব দেশেই আছে, কিন্তু গল্পের নায়ক হবার কোনো যোগ্যতাই তাদের নেই। আমাদের দেশেও আছে এরকম কিছু এজেন্সি, যেখানে কাজ করে অধিকাংশ রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসারেরা। এদের কাজ সাধারণত বিয়ে-ভাঙার গোপন তদন্ত কিংবা কলকারখানায় শ্রমিক অশান্তির ব্যাপারে খবরাখবর সংগ্রহ করা কিংবা ভেজাল ওষুধের কারবার ধরা। এরা প্রায় সবাই বিবাহিত, মধ্যবয়স্ক সংসারী লোক, প্রায় কেউই পকেটে বন্দুক-পিস্তল সঙ্গে রাখে না, দশটা পাঁচটার মতন অফিস করে। এই বাস্তব গোয়েন্দাদের কীর্তিকলাপ লিখলে কেউ পড়বে না!

গল্পের গোয়েন্দাদের সবাই চেনে, নাম শুনলে ট্যাকসি ড্রাইভার পর্যন্ত সেলাম দেয়, কিন্তু এইসব বাস্তব গোয়েন্দাদের কোনো খ্যাতিই নেই। এরা সাধারণ চাকুরে মানুষেরই মতন। ইদানীং অবশ্য কোনো কোনো শখের ডিটেকটিভ সুন্দরী মেয়ে-সেক্রেটারি রেখে চেম্বার সাজিয়ে বসছে কিন্তু পেরি মেজন বা শ্লিম ক্যালাহানের মতন রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার এদের জীবনে কখনো ঘটেছে বলে জানা যায়নি। বোম্বাইতে অবশ্য প্রেমকুমার কিংবা মি. বাওয়ার মতন 'ফরেন ট্রেণ্ড' ডিটেকটিভরাও কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়। এদের মধ্যে প্রেমকুমারের নাম শোনা গিয়েছিল 'পাতিয়ালা শিশুহত্যা মামলায়'—পুলিশ যে কেসের নিষ্পত্তি করতে না পেরে বন্ধ করে দেবার পর ইনি রহস্যের সমাধান করেছিলেন।

শখের গোয়েন্দাদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ, পুলিশের কাছে এদের কোনো মূল্যই নেই। বাস্তবের কোনো সুন্দরবাবু কিংবা মি. কুটস কখনোই অসহায় হয়ে শখের গোয়েন্দাদের কাছে ছুটে যান না সাহায্য চাইতে। কোনো মামলাতেই শখের গোয়েন্দাদের আইনগত স্বীকৃতি নেই, এদের কাজ পুলিশের কাছে খবর পৌঁছে দেওয়া মাত্র।

যারা আসল বাস্তব গোয়েন্দা, অর্থাৎ পুলিশের ডিটেকটিভ বিভাগের লোক, তাঁরা কি গোয়েন্দা গল্প পড়েন? কয়েকজন পড়েন সময় কাটাবার জন্য। উপভোগ করেন রূপকথার মতন। বস্তুত, সত্যিকারের রোমহর্ষক কাণ্ডকারখানার মধ্যে

জড়িয়ে পড়েন পুলিশের ডিটেকটিভ বিভাগের অফিসাররাই। ইদানীংকালের বিখ্যাত দেবী রায়ের কীর্তিকলাপ দেখলে ইন্সপেকটর মেইগ্রের কথাই মনে হয়।

পুলিশ অফিসারদের কীর্তিকলাপের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'দারোগার দপ্তর' এবং পঞ্চানন ঘোষালের লেখায়। নানান সময়ে আমি নিজেও অনেক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলেছি, শুনেছি কয়েকটি কেসের ঘটনা। এঁদের কৃতিত্বের অনেকটাই নির্ভর করে টিম ওয়ার্কের ওপর। তবে, অনেক সময় এঁদের অনেকরকম চমকপ্রদ ছদ্মবেশ ধরতে হয়। কিছুকাল আগে কলকাতার এক বিখ্যাত রাজনৈতিক ডাকাত সর্দারের ওপর নজর রাখার জন্য একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার নাকি এক মাস তাঁর বাড়ির খবরের কাগজের হকার সেজে ছিলেন। এবং রাস্তার সব পাগল নাকি আসল পাগল নয়। সাধু সাবধান!

কলকাতায় কবির সংখ্যা কত

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত গল্পটি নিশ্চয়ই অনেকেরই মনে আছে। কলকাতার একজন বাবু গিয়েছিলেন পশ্চিমে বেড়াতে। প্রচণ্ড শীতের রাতে ঘুটঘুটি অন্ধকারের মধ্যে ট্রেন ধরতে গিয়ে তিনি পড়লেন ভূতের হাতে। ভূতদের বিয়ের আসর থেকে ক্যাংলা নামে একজন ভূত পালিয়েছে। এদের সন্দেহ সেই পলাতক ভূতই সেঁধিয়েছে কলকাতার বাবুর শরীরের মধ্যে। এখন কলকাতার বাবু কি করে প্রমাণ করবেন যে তিনি ক্যাংলা নন, তিনি তিনিই? ভূতেরা কোনো যুক্তিই শোনে না। শেষ পর্যন্ত যখন কলকাতার বাবুটি বললেন যে, তিনি কবিতা লিখতে পারেন, তখন ভূতদের মন একটু টলল। কারণ ক্যাংলা সাত মরণেও কবিতার ক জানে না। কলকাতার বাবু তৎক্ষণাৎ ভূতেব মোড়লের নামে কবিতা রচনা করে ফেললেন—আর অমনি ভূতরা তাকে ছেড়ে দিল সসম্মানে।

আজকাল আর সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। ভালো ভালো ভূতদেরও দেখা পাওয়া যায় না। কবিতা লেখার জন্য কোনো সুবিধেই কেউ পায় না। কবিতা লেখার দোষ থাকলে চাকরি হয় না, প্রেমিকারা আড়ি করে, গুরুজনের ভুরু কুঁচকে যায়, সম্পাদকরাও ঘন ঘন নাম ভুলে যান। কবিরাও এ দেশের উপেক্ষিত আদিবাসী। কবিদের সংখ্যা যদি ভারতীয় ব্যাঘ্রের মতন ক্রমক্ষীয়মাণ হতো, তাহলেও হয়তো রাষ্ট্রসংঘ থেকে 'কবি বাঁচাও' প্রকল্প হতে পারত। কিন্তু শত্রুরের মুখে ছাই দিয়ে কবিদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বেড়েই চলেছে।

কবিদের কি করে চেনা যায়? সেই ধুতি পাঞ্জাবি, কাঁধে রঙীন চাদর আর মাথাভর্তি বাবরি চুলের যুগ কবে শেষ হয়ে গেছে। তিরিশের নিচে বয়েস অথচ ধুতি-পরা কবি এখন একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। মাথায় বাবরি চুল রাখে আজকাল ইংরেজি স্কুলে-পড়া মর্ডান ছেলেরা এবং লোকাল ট্রেনের চা-ওয়ালারা। কবিরা এখন আর ডবল কবি নয়। অর্থাৎ কবি-কবি চেহারা যাদের, তারা কুত্রাপি কবি নয়, বড়জোব রবীন্দ্রসংগীত গায়ক হয়। কারণ, শুনেছি, এখনো মঞ্চে বসে প্যান্ট-শার্ট পরে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করা রীতিসম্মত নয়। কবিরা ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। কিংবা বলা যায় তারা বৈরী নাগাদের মতনই আত্মগোপনকারী। যদিও এদের মতন নিরীহ প্রাণী ভূ-ভারতে নেই।

কলকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে কবিদের আড্ডা আছে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউস, ওয়েলিংটন অঞ্চলে একটি দিশি মদের দোকান, দক্ষিণ কলকাতার একটি চা-খানা। এছাড়া যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর, দেশবন্ধু পার্ক, কয়েকটি রাস্তার মোড় এবং গঙ্গার ধারে সাধু ও গাঁজাখোরদের জটলার মধ্যেও এঁদের দেখা পাওয়া যায়। যারা সন্ধান জানে, শুধু তারাই চিনতে পারে। এই উপজাতিটির পোশাক সাধারণত প্যান্ট ও হাওয়াই শার্ট, সাদামাটা, বহু ব্যবহারে মলিন। এরা চুলে তেল দেয় না বলে সাধারণ লোকের মধ্যে যে একটা ধারণা আছে সেটা ভুল।

কলকাতায় কবির সংখ্যা ঠিক কত? এক পলকে বলে দেওয়া যায় ৯৮১ জন। না, কবিদের কোনো পরিসংখ্যান এখনো নেওয়া হয়নি, ভারতীয় পরিসংখ্যান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা এক কবির স্নেহাশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীকালের কবিদের সম্পর্কে কোনো আগ্রহ দেখিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। আমি নিজেও অবশ্য পথে পথে ঘুরে কবিদের গুণে দেখিনি। তবু আমার দেওয়া এই সংখ্যাটি নিতান্ত মনগড়াও নয়।

সদ্য-প্রকাশিত একটি বইতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যাবতীয় লিটল ম্যাগাজিন বা ছোট সাহিত্য পত্রিকার তালিকা বেরিয়েছে। তার মধ্যে শুধু কলকাতা থেকেই প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনের সংখ্যা ৩২৭, আমি গুণে দেখেছি। এত অবিশ্বাস্য রকমের বেশি সংখ্যক সাহিত্য পত্রিকা পৃথিবীর আর কোনো শহর থেকে প্রকাশিত হয় না। এই একটি ব্যাপারে অন্তত পৃথিবীর আর সমস্ত শহর কলকাতার অনেক পেছনে পড়ে আছে। এই হতভাগ্য শহর এই একটি ব্যাপারে বিশ্বের প্রথম।

প্রতিটি ছোট পত্রিকার সঙ্গেই একটি ছোটখাটো গোষ্ঠী থাকে—যারা ঐ পত্রিকার মূল লেখক। নিজেদের রচনা ছাপাবার প্রয়োজন না থাকলে কে আর শুধু-শুধু নিজের পয়সায় পত্রিকা বার করে! প্রতিটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যদি অন্তত

তিনজন কবিও থাকে, তাহলে ৯৮১ জন কবি তো এই শহরে হেসে খেলেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবু আমার ধারণা, আমি হিসেবে বেশ কম করেই ধরেছি। এই সংখ্যা অনায়াসেই দু'হাজার হতে পারে। এদের মধ্যে নারীর সংখ্যা কিছুতেই কুড়ির বেশি না।

নবীন কবিদের মধ্যে বেশির ভাগই বেকার। কদাচিৎ এক-আধজন চাকরি পেয়ে গেলে বন্ধুবান্ধবদের সিগারেট ও চায়ের খরচ বহন করে। এই সব কবিদের চাকরির ক্ষেত্র খুব সীমিত। ইস্কুল মাস্টারিই অধিকাংশের ললাটলিপি। কিছু-সংখ্যক অধ্যাপক হতে পারেন। সংবাদপত্র অফিসে দেখা যায় দু'চারজনকে। বাকি সব কেরানিগিরি। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেট বা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী মাত্র দু'-চারজন। একজন ইঞ্জিনীয়ার ও একজন ডাক্তারেরও সন্ধান পাওয়া গেছে।

এরা কবিতা লেখে কেন? এই দুঃস্বপ্নের শহর, এত আবর্জনা, এত সমস্যা, এত অনাচার—এর মধ্যেও শত শত যুবক কেন এবং কিসের আশায় কবিতা লিখে চলেছে? এর উত্তর জানা সহজ নয়। কবিতা লেখার জন্য কেউ প্রতিদান আশা করে না, সেইজন্যই এদের কোনো হতাশা নেই। তবে, একটা কথা অনায়াসেই বলা যায়। এই শহরটি শুধু রাজনৈতিক ছোকরাদের—এরকম একটা ধারণা যে অনেকের মনে সৃষ্টি হয়ে গেছে, তা মোটেই ঠিক নয়। এই শহরটা কবিদেরও। অনেক মধ্যরাতেই এই শহর শাসন করে চারজন যুবক, যাদের হাতে আছে কবিতার চাবুক।

কবিতার জন্য কিছুই পায় না, কিছুই চায় না ওরা—তবু একটি কবিতা রচনার পর, কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে কবিতা বিষয়ে আলোচনা করার সময়, এদের মুখে এক প্রকার উজ্জ্বল আলো ফুটে বেরোয়। তখন, নিভৃতে এদের ভারী সুন্দর দেখায়।

সূর্য অস্ত গেল, দক্ষিণ দিকে

চমৎকার ছবির মতন বাড়ি। দক্ষিণ দিকটা একেবারে ফাঁকা, মাঠের ওপাশে নদী। বাড়ির ডানদিকে তাকালে মেঘ-ছোঁয়া পাহাড়ের সারি দেখা যায়। বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নায়িকা অবশ্যই তন্বী এবং রূপসী, স্নান সেরে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে, পায়ে তার লাল রঙের চটি। বাগানের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে নায়ক। দু'জনে মন্থর গতিতে হাঁটতে হাঁটতে চলে এল নদীর কাছে। ঘাসের ওপর বসল। ক্রমশ নদীর জলে রক্তবর্ণের ছায়া পড়ে। মাথার ওপর দিয়ে সাতটি বক ঠিক মালার মতন সারবদ্ধ হয়ে উড়ে গেল। নায়িকার কপালে এসে পড়ছে চূর্ণ

অলক, হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে সে একদৃষ্টে দেখছে সূর্যাস্ত, তার ঠিক সামনেই নদীর ওপরে তপনদেব বিশ্রাম নিতে চলেছেন।

এইখানে পাঠক থমকে যাবেন। লেখক তো খুব মুডের মাথায় লিখে গেছেন। কিন্তু পাঠকরা খুব হিসেবী। কোনোরকম গরমিল পাঠক সহ্য করেন না। পাঠক বললেন, বাড়ির দক্ষিণ দিকে যদি নদী হয় তবে তার ওপারে সূর্যাস্ত হয় কি করে? এটা কোন দেশের সূর্য?

লেখকের এখানে কোনো জবাবদিহি নেই। তিনি মাথার ওপর দিয়ে কটা বক উড়ে গেল তা পর্যন্ত গুণেছেন, কিন্তু কোন দিকে যে সূর্য ডোবাচ্ছেন, তা খেয়াল করেননি।

অনেক প্রখ্যাত লেখকের রচনাতেই এরকম ভুল দেখা যায়। পাঠক এই সব ছোটখাটো ভুলের সামনে হোঁচট খেয়ে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু কেন এরকম ভুল হয়? এই ভুল অজ্ঞতার নামান্তর নয়। তবে, শুধুই কি অন্যমনস্কতা?

কালি-কলম-মন, লেখে তিনজন। তিনজন না হলেও অনেক সময় দুজন তো বটেই। মাথা একরকম চিন্তা করছে, হাত লিখছে অন্যরকম—এ অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। কিংবা অনেক সময় মাথার মধ্যে দুটো-তিনটে চিন্তা জংশন স্টেশনের ট্রেন লাইনের মতন পরস্পরকে কাটাকুটি করে চলে যায়।

নায়ক যাবে দিল্লীতে, খড়গপুর স্টেশনে ট্রেন যেই থেমেছে, এমন সময় জানলা দিয়ে দেখতে পেল, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে সুজাতা, সাত বছরে তার চেহারা একটুও বদলায়নি। পাড়ার লাইব্রেরি থেকে এই বই নিয়ে পড়তে পড়তে পাঠক তক্ষুনি মার্জিনে লিখবেন, 'লেখক নিশ্চয়ই গাঁজা খাইয়াছে।' দিল্লী যাবার জন্য ট্রেন খড়গপুরের দিকে ধাওয়া করবে কেন? হ্যাঁ, ভুলই তো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, লেখক এরকম একটা কাঁচা ভুল করলেন কেন? তিনি কি পাঠকের চেয়েও অজ্ঞ? কিন্তু লেখককে তো নানা বিষয়ে জানতেই হয়। আসলে ব্যাপারটা বোধহয় এইরকম। তিনি লিখতে লিখতে একটা ছবি দেখতে পান। তিনি মনশ্চক্ষে দেখছেন, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে সুজাতা, তার কপালে যে ঘাম জমেছে, সেটাও তাঁর নজর এড়ায়নি। কিন্তু স্টেশনের নাম কাহিনীর পক্ষে সেটা বর্ধমান, পাটনা বা কানপুর যে-কোনো একটাই হতে পারত, কিন্তু খড়গপুর লিখেই তো সব গোলমাল করে ফেললেন।

রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসে একটা বেশ মজার ভুল করেছিলেন। দিচ্ছেন প্রখর মধ্যাহ্নের বর্ণনা। সেই সময় গোরা তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে দীর্ঘতর ছায়া ফেলে চলে গেল। দুপুরবেলা দীর্ঘতর ছায়া তৈরি করা খুবই শক্ত। এখানেও মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের চোখে ভেসে উঠেছিল ঐ ছবিটা, তিনি বিভোর হয়ে দেখছিলেন

গোরাকে, সময়ের হিসেব ভুলে গিয়েছিলেন।

নিন্দুকরা অবশ্য এককালে রবীন্দ্রনাথের নানারকম ত্রুটি খুঁজে বার করেছিল। সোনার তরী' কবিতাটি সম্পর্কে দারুণ রাগারাগি করেছিলেন ডি এল রায়। 'শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে'—এই সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, শ্রাবণের আকাশে মেঘের এই চাপল্য কে কবে দেখেছে? তা ছাড়া মেঘ কখনো ঘোরে না, তারা একদিক থেকে আর একদিকে যেতে পারে বড়জোর। তাছাড়া, শ্রাবণ মাসে রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটাই বা সারা হয় কি করে, তখন তো আর আই আর এইট-এর চাষ হতো না।

নাম এবং বয়েসের গোলমাল অনেকেরই হয়। হওয়া উচিত নয়, তবু হয়। নায়িকা গর্ভবতী হবার পর নানান ঘটনার ঘনঘটার পর হিসেব করে দেখা গেল দেড় বছর সময় পার হয়ে গেছে, কিন্তু শিশু তখনও ভূমিষ্ঠ হয়নি। লেখককে এই পয়েন্টে চেপে ধরলে তিনি হয়তো বলে বসতে পারেন যে মহাভারতে আছে না এরকম? আসলে তিনি খেয়াল করেননি। ক্রিকেট খেলার মাঠে হঠাৎ রেফারি এসে ফু-র-র-র করে হুইশেল বাজিয়ে দিল, আর পাঠক রে-রে করে উঠল। কিন্তু লেখক কোনোদিন ক্রিকেট খেলা দেখেননি কিংবা আমপায়ারের কথা জানেন না, এটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় কি?

ভুল দু'রকমের হয়। একরকম ছুটকো ভুল হয়, খেয়াল থাকে না। যার চরম উদাহরণ গল্পের মাঝপথে হঠাৎ নায়িকার নাম বদলে যাওয়া। কিংবা শীতকালে আম খাওয়ার বর্ণনা কিংবা গ্রীষ্মকালে লুচির সঙ্গে বাঁধা কপির তরকারি ছাপা অক্ষরে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। অবশ্য কোলড স্টোরেজের যুগে এটা অসম্ভব নয়। কিন্তু আমরা এ রকম পড়েছি তার আগেকার লেখায়। সত্যজিৎ রায়ের মতন সাবধানী লেখকও লোড শেডিং-এর বর্ণনা দিয়েই তারপর কলিং বেল বাজিয়ে দিয়েছিলেন। আর এক রকম হচ্ছে, খুঁটিনাটি জ্ঞানের অভাব। পাইলট কিংবা কয়লাখনির ম্যানেজার সাধারণ বাংলা গল্প উপন্যাসের নায়ক হয় না, কারণ ওদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে লেখকরা ভালো জানেন না।

সাহেব লেখকরা অবশ্য এই সব বিষয়ে লিখতে গেলে খুব পাকা খোঁজ-খবর নিয়ে নেয়। অথবা সৈনিক বা নাবিকরাও লেখক হয়। কিন্তু ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে এরকম ছোটখাটো ত্রুটির অভাব নেই। অনেক সময় ভুলগুলোই খুব উপভোগ্য। শেক্সপীয়ার রোমিও জুলিয়েটের প্রায় প্রথম দিকেই গদগদ প্রেমিক রোমিওর মুখে হঠাৎ বসিয়েছেন, আমরা কোথায় খেতে যাব? তার একটু আগেই তিনি বলেছেন, তখন সকাল নটা। সকাল নটায় কারুর খিদে পেলেও পেতে পারে, কিন্তু প্রেমিকদেরও কি পায়?

এ পৃথিবী কতখানি বাসযোগ্য

মাঝে মাঝে এমনিই হঠাৎ মনে হয় না, দূর ছাই, আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। যাঁরা ভাগ্যবান ব্যক্তি, তাঁরা অবশ্য বলেন, ধূর শালা—! হয় এরকম, অকস্মাৎ জিভে একটা তেতো স্বাদ আসে, পথিবীর উদ্দেশ্যে টুপি তুলে বলতে ইচ্ছে করে, গুড বাই!

আসলে, কখনো কখনো এরকম মনে হয় বলেই বেশি করে বাঁচতে ইচ্ছে করে। বেঁচে থাকার জন্যই সব মানুষ পাগল। রাস্তায়-ঘাটে দোকানে-বাজারে তাকালেই দেখা যাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের কি বিপুল হুড়োহুড়ি।

ছিপছিপে বৃষ্টির মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একজন মানুষ। সন্ধে নেমে এসেছে তাড়াতাড়ি, ফুটবল সদ্য শেষ হয়েছে বলে ট্রামে-বাসে অসম্ভব ভিড়, ট্যাক্সিগুলি অহংকারী। লোকটির চটিতে কাদা ছেটকায়, তার ওপর একটি চলন্ত গাড়ি আরও কাদার বাটিক ডিজাইন উপহার দিয়ে গেল। এই অবস্থাতেও একজন ক্লান্ত মানুষ বাড়ি ফিরছে। তার বাসভূমির এলাকায় ঘোর অন্ধকার। সিঁড়ি দিয়ে পা আর উঠতে চায় না। সপ্তাহের শেষ দিন, অর্থাৎ বাড়িতে চায়ের চিনি নেই। সামনের দীর্ঘ সন্ধেটা কাটাবার মতন কোনো আনন্দের উপকরণ তার জানা নেই। অন্ধকারে তার মুখটা হতবুদ্ধি হয়ে যায়। তবু এই লোকটিই একটু পরে পকেট থেকে খুচরো পয়সাগুলো বার করে তার মধ্য থেকে সিকি আধুলিগুলো বেছে নিয়ে একটা মাটির ভাঁড়ে জমাবে।

পৃথিবীর চেয়ে আর কোনো ভালো জায়গা আমরা আজ পর্যন্ত চোখে দেখি নি। খারাপ জায়গাও না। সেই জন্যই স্বর্গ আর নরকের মতন দুটো ব্যাপার আমাদের কল্পনা করে নিতে হয়েছে। তুলনা না করতে পারলে কোনো কিছুই ভালো লাগে না। পৃথিবীতেও অবশ্য অনেক সময় নরক গুলজার হয় বটে, কিন্তু অন্যের চোখের আড়ালে শুধুমাত্র প্রেমিক-প্রেমিকা ছাড়া আর কেউ স্বর্গ রচনা করতে পেরেছে বলে জানা যায় না।

সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে যে ব্যক্তি মধ্যমগ্রাম বা সাঁতরাগাছিতে এক টুকরো জমি কিনে পাঁচ ইঞ্চি দেয়াল গেঁথে একটা ছোট বাড়ি বানাচ্ছে, তার কখনো আপসোস হতে পারে অবশ্য যে, বালিগঞ্জ পাড়ায় একটা বাড়ি আর এ জীবন হলো না। আবার সে এ-ভেবেও নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারে, শহরের ঐ ঘিঞ্জির চেয়ে এই ফাঁকা জায়গা অনেক ভালো, এখানে বাতাস কত স্বাস্থ্যকর, টাটকা শাক সব্জি—। কলকাতায় অফিসে বসে তিনি সহকর্মীদের কাছে চাপা গর্বের সঙ্গে বলেন, আরে মশাই, ইলেকট্রিক ট্রেনে চাপলে মাত্র পঁচিশ মিনিটের জার্নি, একবার

গিয়ে পৌঁছোতে পারলেই যা আরাম—। কিন্তু যেদিন হাওড়া কিংবা শিয়ালদা স্টেশনে ট্রেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্ধ থাকে, অসহ্য গরম, ঘাম, লোকজনের ঠেলাঠেলি, চিৎকার—তখন তার মুখ-চোখে ফুটে ওঠে একটা হিংস্র ভাব। তার মনে হয়, এ পৃথিবীতে মানুষই মানুষকে ঠিক মতন বাঁচতে দিচ্ছে না।

প্রত্যেকবার গ্রীষ্মকালে আমার একটা কথা মনে হয়, এই পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো ভালো জায়গাগুলো সাহেবরা নিয়ে নিয়েছে। কি সুন্দর সব ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বরফ-পড়া দেশ, ওদেশের প্রত্যেকটি মানুষ, এমনকি গরু-ভেড়াও আমাদের থেকে অনেক বেশি স্বাস্থ্যবান হয়। ঠাণ্ডার সময় মানুষের কাজ করার শক্তি অনেক বেশি বাড়ে। শোনা যায় মধ্য এসিয়া থেকে আর্যদের একটি শাখা নাকি চলে আসে ভারতের দিকে। অন্য দু'একটি শাখা যায় ইউরোপে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে অদূরদর্শী কিংবা বোকা আর্যদের শাখাটিই এসেছে ভারতে, অন্যরা কি চমৎকার চমৎকার জায়গাগুলো পেয়ে গেছে। ভারত যখন সভ্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিল, তখনো নাকি পাশ্চাত্য জুড়ে অন্ধকার। কিন্তু ওদের বুদ্ধি একটু দেরিতে খুললেও এখন কি তুলকালাম কাণ্ড সব করছে! রাষ্ট্রসঙ্ঘে একটা প্রস্তাব তোলা যায় না, প্রতি একশো বছর অন্তর উত্তর গোলার্ধের সব মানুষকে চলে আসতে হবে দক্ষিণ গোলার্ধে, এবং এরা যাবে ওদিকে। একটা বদলাবদলি হোক।

এই সঙ্গে আবার আর একটা কথাও আসে। শীতপ্রধান দেশে আত্মহত্যার সংখ্যা বেশি। একবার একটি পরিসংখ্যানে প্রকাশ পেয়েছিল, ফিনল্যাণ্ডের লোকরাই গড়ে বেশি আত্মহত্যা করে। অথচ, সে দেশে একটাও না খেতে পাওয়া গরীব নেই। যেসব দেশকে আমরা আমাদের তুলনাতে অনেক বেশি আরামদায়ক মনে করি, সেসব দেশের মানুষেও আত্মহত্যা করতে চায় কেন? এদিকে, খরা-বিধ্বস্ত বিহারের পালামৌ জেলায় গিয়ে দেখেছিলাম, এক কলসী জলের জন্য দীর্ঘ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কঙ্কালসার নারী পুরুষ, লঙ্গরখানায় হাজার হাজার ক্ষুধার্ত উৎসুক মুখ। কিন্তু এদের মধ্যে একজনও মৃত্যুর আগে নিজে থেকে মরতে চায়নি। একেই মহামায়া না কি যেন বলে।

সমুদ্র, পাহাড় কিংবা বিশাল কোনো নদীর সামনে হঠাৎ দাঁড়ালে মনটা নিজের শরীরের আয়তনের চেয়েও বড়ো হয়ে যায়। আজ নিজের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে মনে হয়, সুন্দর এই পৃথিবী। আমি মানুষ হয়ে জন্মেছি, আমি ধন্য। —এই 'আমি' কিন্তু নিতান্তই শহুরে। শৌখিন মানুষ। ওই সব জায়গা শুধু বেড়াতে যাবার জন্য। বছরে একবার দু'বার গেলে বেশ ভালো লাগে এবং হোটেল-টোটেল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। ওখানে যারা বাস করে তারা দুঃখী মানুষ। নদীর তীরে যাদের বাস, তাদের ভাবনা বারো মাস। সমুদ্রে বা পাহাড়ে যাদের জীবিকা,

তারা এ দেশের দরিদ্রতম মানুষ। দার্জিলিং-এ ফুটফুটে যুবতী পাহাড়ী মেয়েরা মাথায় একটি ফেট্টি বেঁধে দু'মণ তিনমণ মাল এক সঙ্গে বয়ে নিয়ে যায়। আমরা পাহাড়ে বেড়াতে যাই স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে, আর পাহাড়ীদের মধ্যে অধিকাংশই প্রচ্ছন্ন টিবি রুগী।

নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার তুলনায় একজন সাধারণ সওদাগরি হৌসের অফিসারও এখন অনেক আরামে থাকেন। কারণ গ্রীষ্মকালে সিরাজউদ্দৌল্লা শুধু টানা পাখার বাতাস খেতেন, আর অফিসারটি থাকেন এয়ার কনডিশনড ঘরে। ভ্রমণ করার সময় নবাবকে যেতে হতো পাল্কিতে (মোটেই আরামদায়ক নয়), ইনি যান ঝাঁকুনিহীন মোটর গাড়িতে। অভিযানে বেরুলে নবাবকে থাকতে হতো তাঁবুতে, ইনি বিভিন্ন শহরে অভিযানে বেরিয়ে সব সময়েই ওঠেন পাঁচ-তারা মার্কা হোটেলে। তাহলে কি আগেকার দিনের চেয়ে আমরা এখন অনেক ভালো আছি? কবি যদিও বলেছেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর'—কিন্তু এসব কবিদের পাগলামি। জঙ্গলের জীবন আমরা এখন কেউই আর পছন্দ করব না। বিশেষত মেয়েরা, কারণ ওখানে বাথরুম নেই।

আরামদায়ক জীবনের সঙ্গে তবু ভালো থাকা মেলে না। আমাদের দেশে কত ভালো ভালো ছাত্র বিদেশে গিয়ে সেখানেই থেকে যায়। ভালো চাকরি পায়, পরিচ্ছন্ন সুন্দর বাড়ি, নিজস্ব গাড়ি, কোনো খাবারে ভেজাল নেই, ঘরের মধ্যে শীতে গরম ও গরমে ঠাণ্ডা থাকার ব্যবস্থা, রেফ্রিজারেটার, টিভি, ফিল্ম প্রজেক্টার, ক্যামেরা ইত্যাদি হাবিজাবি খেলনারও অন্ত নেই। স্বাস্থ্য ইনসিওর করা আছে। ব্যাংকে টাকা জমছে—তবু কেন এক-একজন দীর্ঘশ্বাস ভরা চিঠি লেখে? কবে ফিরব, কবে ফিরব, এই ব্যাকুল সুর শোনা যায়। দশ-বারো বছর থাকার পরেও এই সঙ্কল্প থেকেই যায়। একদিন না একদিন ঠিক ফিরবই দেশে। দেশ মানে কি? এই পৃথিবীরই তো এক টুকরো জায়গা—খানিকটা ভাবালুতা ছাড়া তার আর আলাদা মূল্য কী আছে? পাশ্চাত্যের এইসব নকল স্বর্গ ছেড়ে এই দারিদ্র্য, শঠতা, তঞ্চকতা, মিথ্যে ও ভেজালে ভর্তি এই পুরোনো জর্জর দেশে ফিরে কি লাভ? তবু মানুষ চাইছে যখন, তাতে মনে হয়, ঐ ভাবালুতাই বেঁচে থাকার জারক রস।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জার্মানিতেও দেখা গেছে, ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে ছোটাছুটি করে মানুষ সিনেমা দেখতে গেছে। ভিয়েৎনামেও প্রণয় ও বিবাহের সংখ্যা কখনো কমেনি। যে-কোনো অবস্থাকেই অস্বীকার করার একটা স্পৃহা আছে মানুষের মধ্যে। সারাদিন পরিশ্রম করার পর সন্ধের সময় গঙ্গার ঘাটে যখন একজন কুলি স্নান করে তখন সে দৃশ্য দেখবার মতো। কি অসীম ভালোবাসায় সে তার শরীরটাকে ঘষে মেজে পরিষ্কার করে। সে দুনিয়ার কোনো খবরই রাখে না। তার কাছে তার

শরীরটাই পৃথিবী। আর যারা এই দুনিয়ার খবর রাখে, তারা অনেক সময়ই পৃথিবীর ওপর বিরক্ত হয়। দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীটা, একথা এদিকে ওদিকে প্রায়ই শোনা যায়। আমাদের মনে থাকে না, এই প্রাকৃতিক পৃথিবী মানুষের দখলে আসার পর বিশেষ কিছু বদলায়নি। বদলেছে শুধু মানুষ, ভালো আর মন্দের তারাই বিধাতা।

আবার এক-একদিন সন্ধেবেলা ফুরফুর হাওয়া দেয়, সব আলো ঠিকঠাক জ্বলে, চায়ে চিনি থাকে, বর্ষার সময়ে মনে হয় চাষীরা আজ আনন্দিত, মেয়েরা বেশি রূপসী হয়ে ওঠে, কেউ পুরোনো ঋণ শোধ করে যায়—আর আজই মনে হয়, আঃ, কি চমৎকার এই বেঁচে থাকা। টাটকা বাদাম ভাজা খেতে খেতেও মনে হয়, এরকম ভালো বাদাম আর আগে দেখিনি।

বিতৃষ্ণার থেকেও এখনো বিস্ময় অনেক বেশি এই পৃথিবীতে। মনের মেঘ ক্ষণে ক্ষণে কেটে যায়, মনে হয়, সামনেই এমন কিছু নতুন ঘটনা আছে, যা জ্যোতিষীরাও জানে না। আর যাই হোক, জীবন তো একটাই। পুরোপুরি দেখে যেতে হবে।

মানুষের কতরকম মুখোশ

রথের মেলায় বাবার হাত ধরে ঘুরছে একটি বাচ্চা ছেলে। সে কিছু একটা জিনিস কিনবে। এক সময় সে একটা মুখোশের দোকান দেখতে পেয়ে বাবাকে টানতে টানতে নিয়ে এল সেখানে। সে মুখোশই কিনতে চায়। তার বাবার খুব একটা ইচ্ছে নেই। তবু বললেন, আচ্ছা কোনো একটা ছোট দেখে।

সেখানে মুখোশ আছে নানা রকমের। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ার থেকে শুরু করে ভূত-প্রেত, সান্টা ক্লস, জমিদারবাবু, বোকা চাকর ইত্যাদি অনেক কিছুই। কোন মুখোশটা যে কিনবে, ছেলেটি তা কিছুতেই ঠিক করতে পারছে না। মহা উৎসাহভরে সে একটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ঐটা নেবো, ঐটা নেবো। দোকানদার সেটা নামাতেই সে আবার আর একটা দেখতে চায়। তার বাবা একটু একটু বিরক্ত হচ্ছেন। তিনি একটা ছোটখাটো সুন্দর মুখোশ দেখিয়ে বললেন, 'ঐটা নাও না!' ছেলেটি তাতে রাজি নয়। তার মুখ দেখে মনে হয়, সে যেন সবগুলোই নিতে চায়।

আমি পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, ব্যাপারটা দেখতে দেখতে আমার একটু হাসি পেল। বাবার তুলনায় ছেলেটিকেই বেশি জ্ঞানী মনে হলো। সে এর মধ্যেই বুঝতে

পেরে গেছে যে তার অনেকগুলি মুখোশ দরকার হবে।

এই ছেলেটি একদিন বড়ো হবে, আশা করছি কিছু লেখাপড়াও শিখবে এবং বাঙালির ছেলে যখন, তখন সম্ভবত চাকরিই করবে। সেই চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে সে প্রথম দেখবে এমন এক ধরনের মুখোশ, যা পৃথিবীর কোথাও কিনতে পাওয়া যায় না। অথচ, সারা পৃথিবী জুড়েই যারা একটু মাঝারি বা বড়ো চাকরির ইন্টারভিউ নেয়, তারা সকলেই হুবহু এক রকম মুখোশ পরে থাকে। সেই মুখোশের আড়ালে তাদের আসল মুখ কেউ কখনো দেখেনি।

এ বিষয়ে আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের বাড়িতে যে বৃদ্ধা রান্নার কাজ করে, তার নাতির একটা কাজ দরকার। স্কুল ফাইনাল পাস করে বসে আছে ছেলেটি। যে-কোনো একটা অফিসে কোনো রকম একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য সে আমাদের বাড়িতে ইদানীং ঘোরাঘুরি করছে। আমাদের নিজেদেরই এখনো নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাবার মতন অবস্থা। তবু একদিন দুর্বলতার মুহূর্তে তাকে একশোটি টাকা দেওয়া হলো, সে একটা কিছুর ব্যবসা করুক। আলু জিনিসটা পচে না—একশো টাকার আলু পাইকারি রেটে কিনে খুচরো বাজারে বিক্রি করলেও তো দু'পাঁচ টাকা লাভ হতে পারে। ছেলেটি এক মাসেব মধ্যে সেই টাকা খরচ করে আবার এসে ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল। আগে সে তবু একটা জামা পরত, এখন ছেঁড়া গেঞ্জি পরে। একদিন ঘরেব মধ্যে সটান ঢুকে পড়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁচুমাচু মুখে বলল, দাদাবাবু, একটা চাকরি না দিলে—

আমি বিরক্তভাবে সোজা হয়ে বসলাম। গম্ভীরভাবে বললাম, দ্যাখো, তুমি এরকমভাবে বিরক্ত করতে আসো কেন? তোমার থেকে অনেক বেশি যোগ্যতা আছে এমন লাখ লাখ ছেলে আজও বেকাব। তুমি নিজের চেষ্টাতেও...

কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার চোখ পড়ল আয়নার দিকে। আমার মুখখানা একদম অন্য রকম হয়ে গেছে। নিজেই চিনতে পারি না! কি কঠোর নৈর্ব্যক্তিক মুখ আমার, অবিকল ইন্টারভিউ বোর্ডের মেম্বারদের মতন। আসলে ঐ ছেলেটির সম্মুখীন হতে আমি অসহায় ও লজ্জা বোধ করছিলাম, সেটা ঢাকবার জন্যই একটা কঠোরতার মুখোশ দরকার হয়েছিল। অন্যদেরও বোধহয় তাই হয়।

আমার একজন অতি-পরিচিত অধ্যাপককে দেখেও একদিন আমি চিনতে পারিনি। কলেজ ছাড়ার বেশ কিছুদিন পর একদিন সন্ধের দিকে গঙ্গার ধারে সামান্য অন্ধকারে গাছের নিচে আমি তাঁকে দেখি। তাঁর পাশে একজন বিদেশিনী মহিলা। মহিলাটি এমনই রূপসী যে তার দিকে অন্তত তিনবার না তাকিয়ে পারা যায় না। সেই কারণেই তৃতীয়বার অধ্যাপকের দিকে আমার চোখ পড়ে। প্রথমে চিনতে

পারিনি। মনে হলো একজন অসম্ভব খুশিতে উচ্ছল যুবক—সেই প্রায়ান্ধকারেও তাঁর চোখ-মুখে ঝকঝক করছে আনন্দ। তাঁর গলার আওয়াজ শুনেই আমার মনে খটকা লাগে।

অধ্যাপকেরাও মানুষ। তাঁদের প্রণয়ের অধিকার নেই, সন্ন্যাসী হয়ে থাকতে হবে—এমন কথা বলা চলে না। বিদেশিনী বান্ধবীকে তিনি গঙ্গার ধারের সৌন্দর্য দেখাতে নিয়ে যাবেনই বা না কেন? কিন্তু ওঁর ক্লাসে পড়ার সময় আমরা ওঁকে কোনোদিন হাসতে দেখিনি। দেখতাম একটা বিমর্ষ ভাবুক মুখ। গঙ্গার ধারে অধ্যাপককে দেখে যে আমি প্রথমে চিনতে পারিনি তার কারণ, সেই দিনই প্রথম আমি তাঁর স্বাভাবিক মুখ দেখি। সেই মুহূর্তে তিনি অধ্যাপক ছিলেন না, মুখোশটা খুলে রেখেছিলেন।

প্রত্যেকটি পুরুষমানুষই মেয়েদের সামনে, প্রত্যেকটি মেয়েই পুরুষদের সামনে একটু না একটু বদলে যায়ই। নারীর সঙ্গে নারী, পুরুষের সঙ্গে পুরুষ আলাদা ভাষায় কথা বলে, মুখের অভিব্যক্তি হয় অন্যরকম। এটাকে ঠিক মুখোশ বলা না গেলেও ব্যক্তিত্বের বদল বলা যেতে পারে হয়তো। বস্তুত, কোনো নারী বা পুরুষই যে সবসময় এক রকম থাকে না, কখনো কখনো নিজেকে বদলায় —সেই সত্যটুকুই জীবনটাকে আকর্ষণীয় করে রেখেছে।

প্রতিটি পরিবারের কর্তাই তাঁব বাড়ির ব্রেকফাস্ট টেবিলে একটি ছোটখাটো হিটলার। যদি না তাঁর স্ত্রী আগে থেকেই নারী হিটলার হয়ে থাকেন। তাঁর হুকুমে সব কিছু চলবে সেখানে। তিনি কখন চা খাবেন কিংবা খবরের কাগজ পড়বেন কিংবা বাথরুমে যাবেন, সেই অনুযায়ী অন্যদের কাজকর্ম ঠিক করতে হবে। তারপর তো তিনি খেয়েদেয়ে রাস্তায় বেরুলেন। ধরা যাক, তিনি একজন সাধারণ চাকুরে। ট্রামে-বাসে যদি যেতে হয়, তাহলে সেই সময়টুকুর জন্য তিনি একজন করুণ মানুষ হয়ে যাবেন। দৈবাৎ যদি কোনো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয় এবং তাঁকে যদি জিজ্ঞেস করেন, কি কেমন আছেন? এবং তিনি যদি হাইপোকনড্রিয়াক হন, তাহলেই শুরু করে দেবেন রোগের ফিরিস্তি। অন্য লোকের রোগের বিবরণ শুনতে কেমন লাগে? শুনছি অথচ শুনছি না। তারপর অফিসে বড়ো সাহেব কিংবা ইউনিয়নের নেতার সঙ্গে দেখা করার সময় যে-কোনো কর্মচারীই দবজাব বাইরে দু'এক মুহূর্ত থামে। তখন পকেট থেকে চট করে সেই মুখোশটা বার করে পরে নিতে হয়। কেননা, বিশেষ ধরনের হাসি মুখোশ ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। আবার বড়ো সাহেবকেও তাঁর বড়ো সাহেবের কাছে কিংবা মন্ত্রীদের কাছে যাবার সময় প্রয়োজন হয় ওই মুখোশটা।

একই মানুষ বাবা এবং ভাই এবং সন্তান এবং স্বামী এবং বন্ধু এবং ভৃত্য।

এই বিভিন্ন ভূমিকায় তার তো প্রায় দিশেহারা হয়ে যাওয়া উচিত। বিখ্যাত অভিনেতারাও মঞ্চে উঠে এক সঙ্গে এতগুলো ভূমিকায় অভিনয় করতে সাহস করবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু সাধারণ মানুষ অবলীলাক্রমে তা পেরে যায়। সুবিধেমত মুখোশ সঙ্গেই থাকে। একমাত্র খাঁটি সন্ন্যাসীদেরই এতগুলি ভূমিকা থাকে না, সন্ন্যাসীরা শুধুই সন্ন্যাসী, তাদের মুখোশের প্রয়োজন নেই, সেই জন্যই বোধ হয় তাঁরা দাড়ি রাখেন।

কিছুদিন আগে একটা আন্দোলন হয়েছিল। সেই সময় তরুণ ছেলেরা বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাছে কার্ড পাঠিয়ে অনুরোধ জানাত, মুখোশ খুলে ফেলুন! মুখোশ খুলে ফেলুন!

ব্যাপারটা যে খুবই চিত্তাকর্ষক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কল্পনা করুন সেই দৃশ্য—রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে পাড়ার গানের মাস্টারমশাই পর্যন্ত সবাই এক সঙ্গে খুলে ফেলেছেন সব রকম মুখোশ। মুহূর্তে বদলে গেল সব দৃশ্য, বদলে গেল এই সমাজ, কেউ কাউকে আর চিনতে পারছে না। থিয়েটারের পর মেকাপ ধোওয়া অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মতন ছলছলে চোখে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে। হয়তো সেই দৃশ্য ভয়াবহ হতে পারে। কত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের আসল মুখ দেখে আমরা আঁতকে উঠব! আদিম মানবগোষ্ঠীর মতন আবার যদি আমরা পরস্পরকে দেখলেই মারামারি শুরু করি?

না, দরকার নেই মুখোশ খোলার। যা চলছে তাই চলুক।

কাজ ও ছুটির সীমানা কোথায়

ভোরবেলা অনেক পার্কে, ময়দানে, ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-উদ্যানে, বালীগঞ্জ লেকে অনেকেই যায় ভ্রমণ করতে। এর মধ্যে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাদের অনেকগুলো ছোট ছোট দল হয়ে যায়, তাঁরা নিয়মিত এক জায়গায় এসে বসেন, এক সঙ্গে ঘুরে বেড়ান।

এ রকম একটি দল, অবাঙালি, এক সকালে আমার পাশ দিয়ে চলে গেলেন, ওরা নিজেদের মধ্যে যে-সব কথা বলছিলেন, তার মধ্যে, ভাও, টেণ্ডার, ব্যাঙ্ক রেট এইসব শব্দ কানে খটখট করে লাগে। আমি একটু চমকে যাই। স্নিগ্ধ বাতাসে একটি অপরূপ ভোর, গাছের পাতা এই বর্ষায় বেশি সবুজ, জলের ওপর হাঁসের ঝাঁক ছবির থেকেও বেশি সুন্দর। এর মধ্যে ভাও, টেণ্ডার, ব্যাঙ্ক রেট? আমার ঠিক যেন বিশ্বাস হলো না। মনে হয় যেন গল্পের মতন, গল্পের ঝানু ব্যবসায়ীরাই

শুধু সব সময় এ রকম কথা বলে।

সন্দেহ নিরসনের জন্য আমি সেই দলটির পেছনে পেছনে খানিক দূর গেলাম। কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম ওঁদের কথা। সত্যি, আশ্চর্যের বিষয়, তাঁরা ব্যাবসার আলোচনাই করছেন খুবই একাগ্র চিত্তে।

এক বিশেষ শ্রেণীর অন্য প্রদেশীয় ব্যবসায়ীদের আমরা ঘৃণা করি, যদিও তারাই আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আমাদের মনে হয়, মানুষের রক্ত শোষণ করে টাকার স্তূপ তৈরি করাই তাদের একমাত্র কাজ। কিন্তু এক এক সময় ভাবি, ওদের কি ছেলেবেলা নেই? ওদের কি ব্যক্তিগত জীবনেও ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা নেই? সবচেয়ে বড়ো কথা, দিনের কোনো সময়েই কি ওদের ছুটি নেই? সারা দিনটাই যার কাজ বা কাজের চিন্তায় কেটে যায়, তার জীবনে আনন্দের স্থান কোথায়? যে লোক অপরূপ ভোরবেলা পার্কে এসেও ব্যাবসার চিন্তা ছাড়তে পারে না, সে যত সার্থকই হোক, তাকে আমরা কৃপা করতে পারি।

শুধু অবাঙালি ব্যবসায়ীদের কথা উল্লেখ করা ভুল হবে। জাতি বিচারের প্রশ্ন ছাড়াও, মানুষের মধ্যে একটা শ্রেণী আছে, তারা ছুটির মর্মই বোঝে না। অফিস থেকে অনেকে মেয়ের বিয়ে, বাবার শ্রাদ্ধ কিংবা বাড়ি তৈরির জন্য ছুটি নেয়, অর্থাৎ আরো বেশি ঝামেলার কাজে জড়িয়ে পড়ে। এই সব লোকেরা অনেকেই অফিসের কাজে ফাঁকি দেয় বটে কিন্তু ছুটির সময়ের কাজে দারুণ খাটে। আবার, রিটায়ার করার পর এরা আর কোনো কাজ খুঁজে পায় না। অনেকের কাছেই আফসোস করে, সময় আর কাটে না ভাই।

ধলভূমগড়ে ব্যানার্জিদা নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। উনি স্টোন চিপসের ব্যাবসা করেন। কথায় কথায় উনি আমাদের একটি পরমাশ্চর্য ঘটনা জানিয়েছিলেন। গত দু' বছরের মধ্যে উনি কোনো সিনেমা দেখেননি, কোথাও বেড়াতে যাননি, গান-বাজনা শোনেননি, বিজনেসটা দাঁড় করাবার জন্য খাটছেন। বিজনেস অবশ্য, ওঁর ভাষায় 'ভগবানের কৃপায়' দাঁড়িয়ে গেছে, ওয়াগন প্রতি পনেরো টাকা ঘুষ দিয়ে উনি দুশো ওয়াগন বুক করে ফেলেছেন। ওঁর স্ত্রী যখনই সিনেমা যাবার জন্য বায়না ধরেন, উনি চারখানা টিকিট কাটিয়ে দিয়ে বলেন, যাকে খুশি সঙ্গে নিয়ে যাও! এর পরও আপত্তি করলে, পাঁচশো, হাজার টাকা ফেলে দিয়ে বলেন, শাড়ি কেনো না, গয়না কেনো না!

লোকটির চরিত্র এতই অবিশ্বাস্য যে, একে নিয়ে গল্পও লেখা যায় না। এইসব লোক ভেবে রাখে যে, প্রচুর কাজ করে একদিন প্রচুর টাকা পয়সা করব, তারপর ছুটি নেব। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষিত ছুটি আর কখনো আসে না। অতিরিক্ত মানসিক উদ্বেগ ও কম শারীরিক পরিশ্রমের ফলে ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস জাতীয় রোগ

এসে যায় আগেই। তার ফলে, ভোরবেলা পার্কে ভ্রমণ এবং সেখানেও বিজনেসের আলোচনা।

রিলাক্সেশন শব্দটি অনেক অশিক্ষিত লোকও জানে, মিলখা সিং জাতীয় খেলোয়াড়রা ছাড়া। কিন্তু ছুটির সঙ্গে এই সাহেবী শব্দ বা ধারণাটির কোনো মিল নেই। বারে-রেস্তোরাঁয় এবং অন্য নানা জায়গায় এই শব্দটি নানা উচ্চারণে প্রায়ই শোনা যায়। আমরা সকলেই জানি, অনেক বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী বা সার্থক ব্যক্তি বা কর্মবীর অথবা উচ্চপদস্থ কর্মচারী নানা পাপচক্রে লিপ্ত থাকে। অর্থাৎ কিনা খুব মদ খেয়ে হৈল-হল্লা কিংবা মেয়েমানুষ নিয়ে ফূর্তি। পাপের প্রশ্ন এখানে অবান্তর—কিন্তু এইসব কাজ ঐসব মানুষ যে করে, তার যুক্তি ঐ রিলাক্সেশান। কিন্তু ঐ ব্যাপার দুটিই আসলে অত্যন্ত টেনশানের। এর মধ্যে একাকীত্ব নেই। এর মধ্যে জড়িত থাকে এমন সব সাঙ্গোপাঙ্গ কিংবা কুকাজের সঙ্গী যে তারা পুরো ব্যাপারটাই জট পাকিয়ে রাখে। তারই ফল হিসেবে কখনো কখনো শোনা যায়, বোম্বাইয়ের সমুদ্রে কোনো শিল্পপতি ও তরুণীর ভাসমান মৃতদেহ।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন, যে-কোনো বিভাগেই যে-সব ব্যক্তি প্রতিভাবান তারা বেশি নারীসঙ্গ কামনা করে। নারীর সাহচর্য ছাড়া প্রতিভাবানদের ক্ষমতার ঠিক বিকাশ হয় না। নানা ধরনের কর্মবীরদেরও হয়তো আমরা প্রতিভাবান বলতে পারি, কিন্তু যারা টাকা দিয়ে নারীকে কিনতে চায়, তাদের মতন দুর্ভাগা আর নেই। নারীর কমনীয়তার কাছে পুরুষের যে নিভৃত ছুটি থাকে, তার স্বাদ তারা কোনোদিন পাবে না!

যারা খুব বেশি তাস খেলে, তারা রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তাসের স্বপ্ন দেখে। দেখবেই, এটা একটা বাঁধা ব্যাপার। সারাদিন কাজকর্মের পর অনেকেই সন্ধের পর তাস খেলতে যায়। এমন মানুষ অনেক আছে, যারা যে-কোনো একটু সময় খালি পেলেই চোখের সামনে কোনো হালকা অথবা ডিটেকটিভ বই খুলে বসে। এরা মন কিংবা মাথাকে কখনো খালি রাখতে চায় না। কোনো কাজ না থাকলেই যদি নিজের মুখোমুখি বসতে হয়! সেটা একটা ভয়ের ব্যাপার। খুব কম লোকই বিজনে নিজের সঙ্গে দেখা করে।

অনেক লেখক বা শিল্পীকে দেখা যায়, বিছানায় শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছাদের দিকে চেয়ে আছে। কিংবা পা দোলাচ্ছে। আপাতত মনে হয়, এদের মতন অলস আর কেউ নেই। কিন্তু এরাও আসলে বিষম ব্যস্ত। এদের মাথার মধ্যে সব সময় পোকা ঘুরঘুর করে। কোনো চিকিৎসাতেই সেই পোকা মরে না। পোকাগুলি বেশি প্রবল হয়ে গেলে এরা পাগল হয়ে যায়। আনুপাতিক হারে লেখক শিল্পীদের মধ্যেই পাগলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। পাগলামি জিনিসটা কিন্তু এক হিসেবে ভালো,

মৃত্যু ছাড়া, একমাত্র এই অবস্থাতেই পাওয়া যায় অখণ্ড অবসর।

পরীক্ষার আগে সব ছাত্রছাত্রীই ভাবে, একবার হয়ে যাক না পরীক্ষাটা, তারপর কত কি করব! কিন্তু পরীক্ষার পর ফাঁকা সময়টায় আর বিশেষ কিছুই করবার থাকে না। তখন আবার মনটা ছটফট করে। কবে কলেজ খুলবে, সেইজন্য অধীর প্রতীক্ষা। কলেজ খোলে, আবার পরীক্ষা। কলেজ-জীবন শেষ হয়ে যায়, তবু পরীক্ষার আর শেষ হয় না। এই সময় সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তারপর বিশ্রাম নেয়। কিন্তু বিশ্রাম আর ছুটি তো এক নয়।

ছুটি তাহলে কি? প্রত্যেকেরই একটা কিছু নিজস্ব কাজ আছে। কেউ মাঠে লাঙল চষে, কেউ অফিসে কলম পেষে। এই কাজের বাইরেও একটা পৃথিবী আছে, সেই পৃথিবীর দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া, নিজেকে তার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়াই তো ছুটি। মাঠ থেকে ফিরে যে চাষী রামায়ণ গানের আসরে গিয়ে দু'দণ্ড বসে, তার ঠোঁটের হাসিটা সহজে তিক্ত হয় না। এক্ষুনি কেউ বলবেন, যে লোক দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না, সে আবার রামায়ণের আসরে বসবে কি? সব সময়েই তো তার খাবারের চিন্তা! কথাটা ঠিক সত্যি নয়। কুলি কিংবা রিকশাওয়ালারা রাত জেগে মাঝে মাঝেই 'রামা হৈ' গান জুড়ে দেয় দল বেঁধে। সেই গানের সুর প্রতিবেশীদের বিরক্তি উৎপাদন ঘটায় ঠিকই, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওরা যখন এই নিয়ে মেতে থাকে—তখন এক ধরনের আনন্দ পায় ঠিকই। সেই সময়টা তারা খাদ্যচিন্তা করলেও তো পারত। প্রত্যেক মানুষেরই চরিত্রে একটা-না-একটা অকাজের দিক আছে, সেটা সব সময় সে নিজেই জানতে পারে না। এক সময় একজন প্রেসের ম্যানেজারকে আমি চিনতাম, যার প্রধান কাজই ছিল আমার কাছে এসে টাকার তাগাদা দেওয়া। তিনি টাকাপয়সার কথা ছাড়া আর কোনো কথাই জানতেন না। সেই জন্য ওঁকে দেখলেই আমি ভয় পেতাম, লুকিয়ে পড়ার চেষ্টা করতাম। একদিন এসে উনি বললেন, আমি আর দিন সাতেক আসব না, শৌলমারিতে নেতাজীকে দেখতে যাচ্ছি। আমি অবাক। ওঁকে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, শৌলমারির সাধু নেতাজী হতেই পারেন না, নেতাজী হলে ইত্যাদি। উনি বললেন, যে যাই বলুন, আমি একবার নিজের চোখে দেখে আসব। গাড়ি ভাড়া সব জোটাতে না পারি, খানিকটা রাস্তা পায়ে হেঁটে যাব। চল্লিশ সালে আমি ওঁর বাড়িতে একবার গিয়েছিলাম। উনি বলেছিলেন, আবার এসো! তারপর উনি কোথায় চলে গেলেন। আর দেখা হলো না, এ দুঃখ আমার মরলেও যাবে না। আমাকে শৌলমারিতে গিয়ে একবার দেখে আসতেই হবে নিজের চোখে—

অসম্ভব একটা জেদে লোকটির মুখ জ্বলজ্বল করছিল। এতদিন ওঁকে আমি

একজন নিছক প্রেস-কর্মচারী বলেই ভাবতাম। সেদিন থেকে ওঁর প্রতি আমার একটা শ্রদ্ধা জন্মে গেল। লোকটি শুধু কর্মচারীই নয়, ওঁর মনের মধ্যে কোথাও একটা ছুটি লুকিয়ে আছে।

তখনই আমার মনে পড়েছিল রামগড়ে ছোট ছোট পাহাড়ের ওপর মেঘ-ঘনিয়ে-আসা এক সন্ধ্যায় বলেছিলাম, শিগগির আবার ফিরে আসব। যাওয়া হয়নি। ভয় হয়, অন্যমনে কখন ছুটি ফুরিয়ে না যায়!

পরিচিত জগতের সীমার বাইরে

একটি রং-চঙে স্কার্টপরা যুবতী বিদেশিনী ঢুকল এসে আমাদেব ঘরে। অফিসে। ভাঙা উচ্চারণে সে একটি বাংলা নাম বলল। আমাদের এক সহকর্মীর সঙ্গে সে সিনেমা বিষয়ে একটু আলোচনা করতে চায়। আমেরিকায় সে সেই সহকর্মীর একটি উপন্যাসের সত্যজিৎ রায় -কৃত চলচ্চিত্র দেখেছে, তাই এই উৎসাহ।

আমাদের সহকর্মী তাকে বললেন, বসুন!

মেয়েটি চেয়ার টেনে নিয়ে সহাস্যে বলল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার হাতে মাত্র চার মিনিট সময় আছে।

অন্য টেবিল থেকে আমরা একটু উৎসুকভাবে তাকিয়ে ছিলাম। চার মিনিটের কথা শুনে নড়েচড়ে বসলাম। আমরা কখনো কারুর সঙ্গে স্বেচ্ছায় চার মিনিটের জন্য দেখা করতে যাই না, যদি-না যাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি তিনিই সেই সময় বেঁধে দেন।

সহকর্মী বললেন, চার মিনিট। সে তো অনেক সময়।

মেয়েটি, তার হাসিটাকে বিস্ফারিত করে বলল, আমি জানি, চার মিনিটে কোনো কথাই বলা যায় না। কিন্তু কি করব আমাকে এখান থেকে বেরিয়েই সোজা এয়ারপোর্টে গিয়ে প্লেন ধরতে হবে।

—এখান থেকে কোথায় যাবে?

—জাপান। কেন চলে যাচ্ছি, জানো? আমার ভিসা ফুরিয়ে গেছে। তোমাদের সরকার বলছে, আমি নাকি এখানে বে-আইনিভাবে আছি। কি যে সব আইনকানুন বুঝি না। কলকাতা আমার চমৎকার লাগছে, কি সুন্দর যখন-তখন বৃষ্টি, রাস্তাগুলো হঠাৎ-হঠাৎ নদী হয়ে যেতে দেখলে এত ভালো লাগে...আমি আবার আসব, যে-করেই হোক কলকাতায় আবার আসবই—

মেয়েটি চার মিনিটের বদলে সাত মিনিট থেকেছিল। তারপর প্রায় ছুটতে

ছুটতে বেরিয়ে গেল। আমাদের সহকর্মী তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে বললেন, এখন কলকাতা, রাত্তিরে জাপান, আবার হয়তো পরশু অস্ট্রেলিয়া—অদ্ভুত জাত একটা!

মেয়েটির ঐ জোর দিয়ে বলা, আবার কলকাতায় ফিরে আসব, শুনতে বেশ ভালো লেগেছিল। কেন আসতে চায় এই শহরে, এই বিশ্বনিন্দিত নরককুণ্ডে! এত বেশি নিন্দের জন্যই হয়তো কারুর কারুর বেশি আগ্রহ জাগে।

হিপি-ইনফ্লাক্স-এর পর থেকে ভ্রাম্যমাণ আমেরিকান সম্পর্কে আমাদের এখন আর তেমন আগ্রহ নেই। তবু, একটি অল্পবয়েসী মেয়েকে একা-একা সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াতে দেখলে কিছুটা চমৎকৃত হতেই হয়। ভ্রমণের নেশা আছে বটে এই জাতটার। হিপিদের তবু একটা কারণ ছিল, ভিয়েৎনাম যুদ্ধে লড়াই করার বদলে অনেক ছেলে দেশ থেকে পালিয়ে হিপি হয়ে যেত, সঙ্গে নিয়ে আসত মেয়েবন্ধুদের। এখন ভিয়েৎনাম যুদ্ধ থেমে গেছে তবু হিপি আগমনের বিরাম নেই। চিন্তা-ভাবনাহীন ভ্রমণের নেশাটা পেয়ে বসেছে।

একথা ঠিক, টাকা থাকলেই এরকম ভ্রমণ সম্ভব। আমেরিকানদের টাকার অভাব নেই, তাই সারা পৃথিবীতে যত্রতত্র দেখা যায় তাদের। তাছাড়া, শোনা যায় বহু দেশে নানারকম আমেরিকান স্পাইতেও ছেয়ে আছে—অনেক রকম তাদের ছদ্মবেশ। এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক স্পাই থাকতেই পারে। অবশ্য স্পাইদের ব্যাপারে আমি কোনো রকম বিরূপ ধারণা পোষণ করি না।

রঙীন স্কার্টপরা ঐ মেয়েটিকে দেখে আমার মনে পড়ল অন্য একটি মেয়ের কথা। অনেকদিন আগে আমি 'বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প' নামের একটি ইউনেস্কো পরিচালিত ব্যাপারে ছোট কাজ করতাম। আমাদের কাজ ছিল গ্রামে গ্রামে ঘুরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। বয়স্ক অশিক্ষিত লোকেরা যখন কথা বলে কতগুলো শব্দ তারা ব্যবহার করে, কি কি শুদ্ধ বাংলা তারা বোঝে। সেই কাজে বর্ধমানের একটা গ্রামে আমরা গেছি। কুড়ি-একুশ জনের মধ্যে তিনটি মেয়েও ছিল। এক দুপুরে আমরা তিনজন যুবক ঠিক করলাম, পায়ে হেঁটে দামোদর নদী পার হব।

তখনো দামোদরের বাঁধ সম্পূর্ণ হয়নি, বিশাল নদীটি প্রায় মুমূর্ষ মহাকাব্যের নায়কের মতন বালির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। অধিকাংশ জায়গাতেই বালি, মাঝে মাঝে জল রয়েছে, সেই জলের গভীরতা কোথায় কতটুকু আমরা জানি না। কিন্তু আমরা তিনজনেই সাঁতার জানি। শহুরে ছেলের পক্ষে এইভাবে নদী পার হওয়াই এক দারুণ অ্যাডভেঞ্চার।

একটু বাদে দেখি আমাদের পেছনে পেছনে আমাদের দলের একটি মেয়েও আসছে, তার নাম ধরা যাক সীমা। আমরা সীমাকে বারবার বারণ করলাম। অন্য

মেয়েরা ও সহকর্মীরা সীমাকে ফিরে যাবার জন্য অনেকবার অনুরোধ করল। আমাদের অফিসার পর্যন্ত তাঁর আপত্তি জানালেন। সীমা কিছুতেই শুনবে না। সে যাবেই।

তখন নদী বেশ চওড়া ছিল, বালির ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে পার হতেই অনেক সময় লাগে, মাঝে মাঝেই কোমর জল পাচ্ছি। যে-কোনো জায়গায় ডুব জল থাকতে পারে। এই রকম একবার জলে পা দিয়ে সীমা আমাদের জানাল যে, সে সাঁতারও জানে না।

আমরা খুব ধমকালাম তাকে। সীমা হাসতে হাসতে বলল, আমার যাই হোক না, আমি তো তোমাদের বাঁচাতে বলিনি আমাকে। আমি কোনোদিন একলা-একলা কোথাও যাইনি, আমার ভীষণ ইচ্ছে করে—

সীমার বয়েস তখন উনিশ-কুড়ি, তার স্বভাবে কোনো আধো-আধো ন্যাকা ভাব ছিল না, সে পরিষ্কারভাবে কথা বলতে পারত। সে আমাদের জানিয়েছিল সে পায়ে হেঁটে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে। সে সাইকেল নিয়েও বেরিয়ে পড়তে পারে।

সাইকেল নিয়ে অনেক ছেলেই বিদেশ ঘুরে এসেছে আগে, এখনো যাচ্ছে। এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু কোনো মেয়ে, বাঙালি মেয়ে, এইভাবে পৃথিবী ঘুরতে যাবে, আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না।

আমরা সীমাকে উপহাস করেছিলাম।

সীমা রেগে গিয়ে বলেছিল, কেন, পারব না?

আমাদের মুখে এসে গিয়েছিল, তুমি মেয়ে, শুধু এইজন্য পারবে না।

কিন্তু এটা রূঢ় কথা, তাই ওর সামনে আর উচ্চারণ করিনি।

সীমা সেবার আমাদের সঙ্গে দামোদর পার হয়েছিল ঠিকই। একবারও আমাদের সাহায্য নেয়নি। সাঁতার না জেনেও সে বুক জলে নামতে ভয় পায় নি একটুও। ওপারে পৌঁছে বিজয়িনীর মতন সে বলেছিল, দেখো, একদিন ব্রাজিল কিংবা লিবিয়া থেকে তোমাদের কাছে ছবির পোস্টকার্ড পাঠাব।

আমাদের সেই চাকরির মেয়াদ ছিল মাত্র তিন মাসের। তারপর সবাই ছিটকে পড়লাম নানা দিকে, কারুর সঙ্গে আর কারুর দেখা হবার কথা নয়।

তবু সীমাকে আমি দেখেছিলাম, ছ'সাত বছর বাদে। মেট্রো সিনেমার সামনের ফুটপাথ থেকে কি যেন কিনছিল। সঙ্গে দুটি বাচ্চা ও রোগা চেহারার স্বামী। সীমাও যথেষ্ট রোগা হয়ে গেছে, কণ্ঠার হাড়ে লেখা আছে কয়েকটি দুঃখের অক্ষর।

পাশ কাটিয়ে চলে যাবার আগেই সে আমাকে চিনতে পারল। আলাপ করিয়ে দিল তার স্বামীর সঙ্গে। দু'চারটি ভদ্রতাসূচক বাক্য বিনিময় হলো।

সীমাকে দেখা মাত্রই আমার মনে পড়েছিল সেই ব্রাজিল কিংবা লিবিয়া থেকে ছবির পোস্টকার্ড পাঠানোর কথা। সে রকম কিছু আমি কখনো পাইনি। সীমার বোধহয় সে কথা মনেও নেই।

সীমার বিয়ে হয়েছে যাদবপুরের দিকে। সে তার বাবা-মায়ের নটি সন্তানের একজন বলেই তার বাবা-মা হুড়োহুড়ি করে তার বিয়েটা সেরে দিয়েছেন। পুজোর ছুটিতে ঘাটশীলা বা ঐরকম কোনো জায়গা ছাড়া আর বেশি দূর তার ভ্রমণ হয়েছে বলে মনে হয় না।

আমরা সীমাকে মনে মনে বলেছিলাম, তুমি পারবে না। তুমি মেয়ে বলেই পারবে না। কিন্তু এটা তো কোনো রকম অভিশাপ ছিল না। সে যেতে পারলে তো আমরা খুশিই হতাম। কেন পারল না?

এই তুলনাতেই রঙীন স্কার্টপরা বিদেশিনী যুবতীটিকে কত স্বাধীন মনে হয়। সে একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে মাত্র সাত মিনিট কথা বলেই বিমানে উড়ে অন্য দেশে চলে যায়। কত জোর দিয়ে সে বলে, আবার কলকাতায় ফিরে আসব।

এই মেয়েটি সত্যই আবার কলকাতায় ফিরে এলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সেইটাই স্বাভাবিক। সেইজন্যেই এত জোর দিয়ে ওরা কথা বলতে পারে। সীমার সঙ্গে এই মেয়েটির তফাত কি শুধু এইটুকুই যে এ জন্মেছে একটা অত্যন্ত ধনশালী দেশে! মানুষের জন্মটাও এতখানি মূল্যবান!

অফিস থেকে রাস্তায় বেরিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটার পর আমি আবার দুটি দৃশ্য দেখি। তিনজন বিদেশী ও বিদেশিনী কাঁধে হাত রেখে অলসভাবে হাঁটছে। প্রত্যেকের কাধে একটা করে ঝোলা, পোশাক এতই মলিন ও শতচ্ছিন্ন যে এদেব বিমানযাত্রী বলে মনে হয় না। আফগানিস্তান থেকে হাঁটাপথে যারা এদেশে ঢোকে, মনে হয় সেই দলের। পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের কথাবার্তার দু'-এক টুকরো শুনতে পেলাম। ইংরেজি নয়, মনে হয় গ্রীক। অবশ্য যে কোনো অচেনা ভাষাই আমার কাছে গ্রীক।

তারপর ময়দানে আমি দেখতে পাই, একটি আট-ন' বছরের মেয়েকে সাইকেল চড়া শেখাচ্ছে কয়েকটি ছেলে। বাচ্চা মেয়েটি খানিকটা দূর গিয়েই সাইকেল সমেত ধপাস করে পড়ে যাচ্ছে। তবুও তার কি পরিষ্কার রিনরিনে কণ্ঠের হাসি।

এই মেয়েটি দু-চার দিনের মধ্যেই সাইকেল চড়া শিখে যাবে। একে দেখে আবার সীমার কথা মনে পড়ে। সীমা সাইকেল চালাতে জানত। এই মেয়েটি যখন বড়ো হয়ে উঠবে তখন সময় অনেক বদলে যাবে নিশ্চয়ই। তখন কি এই মেয়েটি ইচ্ছে হলে একলা বা বন্ধুদের সঙ্গে যে-কোনো দেশে, যে-কোনো জায়গায় বেড়াতে

যেতে পারবে? ছোট পরিচিত জগতের সীমা ভেঙে দিয়ে এ কি বেরুতে পারবে বাইরে? সীমা নামের মেয়েটি যা পারেনি? নাকি তখনো দশ বছর পরেকার আমাদের দেশেও শুধু ধনবানরাই পাবে বিমানে চড়ে বিদেশে ভ্রমণের সুযোগ? বাদবাকিরা এই পৃথিবীর কিছুই দেখবে না?

জীবনে কি হতে চেয়েছিলাম

পুরোনো অ্যালবামের পাতা ওল্টালে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখা যায়। মনে করুন, আপনারই সামনে বসে আছেন দু'-তিনজন ভদ্রলোক ও মহিলা। অ্যালবামে তাঁদেরই খুব ছেলেবেলার ছবি। একদম চেনা যায় না। কেউ কেউ প্রশ্ন করে, কি মিল খুঁজে পাচ্ছেন? ভদ্রতার খাতিরে অনেক সময় বলতে হয় বটে যে, হ্যাঁ, চোখ দুটো দেখলে চেনা যায়, কিন্তু থুতনি বা নাক। আসলে কিন্তু চিনতে পারি না আমি। এমনকি নিজের ছেলেবেলার ছবি দেখলেও চিনতে পারি না।

এক জীবনে মানুষ দু'রকম চেহারা পায়। শৈশব থেকে প্রথম যৌবন পর্যন্ত যে চেহারা, তার সঙ্গে বাকি জীবনটার কোনো মিলই নেই। আমার দৃঢ় ধারণা, প্রত্যেক মানুষই দ্বিজ। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নিকসনের বাল্য বয়েসের ছবি ছাপা হয়েছে বিখ্যাত সাপ্তাহিকে, তারই পাশে তাঁর এখনকার বয়েসের ছবি। দেখলে সেই পুরোনো গল্পটা মনে পড়ে যায়। একজন শিল্পী একজন দেবদূতের ছবি আঁকার জন্য একজন মডেল খুঁজছিলেন। অনেক বেছে বেছে এক অনিন্দ্যকান্তি কিশোরকে তাঁর পছন্দ হয়। সেই কিশোরের মুখচোখে স্বর্গের আভা। এর দশ-পনেরো বছর বাদে শিল্পীটি আবার শয়তানের ছবি আঁকার জন্য মডেল খুঁজতে লাগলেন। ঘুরতে লাগলেন বিভিন্ন জেলখানায়। শেষ পর্যন্ত যে কুখ্যাত অপরাধীর মুখখানা তাঁর পছন্দ হলো—সে, অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ল, ওই আগের কিশোরটিই।

মানুষের জীবনটা বড়ো নিষ্ঠুর রকমের করুণ। এখানে দুঃখ আছে যেমন, তেমন সুখও আছে বটে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আছে অতৃপ্তি। জীবনের মধ্যপথে এসে হঠাৎ একটা সন্ধেবেলায় মনে হয়, কিছুই যেন ঠিক মতন হলো না! এ জীবনটা অন্য রকম হবার কথা ছিল।

ছেলেবেলায় অনেক রকম স্বপ্ন থাকে। একলা-একলা একটি শিশু যখন একটা লাঠিকে তলোয়ার বানিয়ে খেলা করে, তখন দূর থেকে তাকে লক্ষ করলে একটা অদ্ভুত আনন্দ পাওয়া যায়। সব শিশুই তখন 'রূপকথার রাজপুত্র', সে লড়াই করছে দৈত্য-দানব অর্থাৎ অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে। সে দস্যুর হাত থেকে

বিপন্না নারীকে উদ্ধার করছে। হায়, এই শিশুই বড়ো হয়ে নিজেই হয়তো অনেক নারীকে বিপন্না করে। তাকে শায়েস্তা করার জন্য এই সমাজ ব্যস্ত হয়ে থাকে। কেন এরকম হয়?

একটি ছেলে ডাক্তার হতে চেয়েছিল। থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় তার বাবা মারা যায়, বিরাট সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে তার ঘাড়ে। পড়াশুনো ছেড়ে দিতে হয়। এখন সে একটি ওষুধ কোম্পানির ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা। তরুণ ডাক্তাররাও অনেক সময় অবজ্ঞা করে কথা বলে তার সঙ্গে। আমি নিজেই চিনি ছেলেটিকে। সে কি সবসময় দুঃখী থাকে? তা মোটেই না। সে চায়ের দোকানে আড্ডা দেয়, সিনেমায় গিয়ে হাসে, একসঙ্গে দুটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলা করে। কিন্তু এর চেয়েও বড়ো কথা, সে অন্য অনেকের সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করে, সামান্য ঝগড়াতেই এমন কঠোর তিক্ত ভাষা বেরিয়ে আসে তার মুখ দিয়ে, যা কল্পনাই করা যায় না! কেন তার স্বভাবের এই তিক্ততা, তা বোঝা খুব শক্ত নয়।

কলেজে আমাদের সহপাঠী ছিল শুভংকর, যে প্রায়ই আমার কাছে এক টাকা দু' টাকা ধার চাইত। যদিও জানতাম, শুভংকর খুব বড়লোকের বাড়ির ছেলে। একদিন জানতে পারলাম, শুভংকর দিনের পর দিন নিজের বাড়িতে কিছু খায় না, বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে পয়সা ধার করে শিয়ালদার কাছে শস্তা হোটেল থেকে খাবার খেয়ে বাড়ি ফেরে। শুভংকর হঠাৎ একদিন জানতে পেরেছিল, পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময়, যখন সে খুবই ছোট, তাদের বাড়িতে কয়েক হাজার মন চাল লুকোনো ছিল। অথচ তাদেরই বাড়ির সামনে না-খেতে-পাওয়া মানুষের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছে। শৈশবে ব্যাপারটার তাৎপর্য বুঝতে পারেনি, পরে অন্যান্যদের কথাবার্তায় জানতে পারে। এই উপলব্ধি ওর মধ্যে একটা গভীর পরিবর্তন ঘটায়, বাড়ির প্রতি একটা ঘৃণা জন্মে যায় ওর। এখন নিজে বাড়ির খাবার না খেয়ে সেই প্রায়শ্চিত্ত করছে।

এ ভাবে বেশি দিন চলে না। কোনোক্রমে বি. এ. পাস করে শুভংকর একটা সামান্য স্কুল মাস্টারি নিয়ে চলে যায় উত্তরবঙ্গে। এটা নিছক একটা জেদের ব্যাপার। শুভংকর অন্য রকম হতে চায়। পারেনি। প্রাইভেট টিউশানির সূত্রে শুভংকরের প্রণয় হয় এক ধনী কন্যার সঙ্গে। শুভংকরের চেহারা ও আচার-আচরণ ছিল বনেদী বাড়ির মতনই, অল্পবয়েসী মেয়েটি তাকে দেখে আকৃষ্ট হয় এবং বাড়ির ঘোর অমতেই শুভংকরকে বিয়ে করে। মেয়েটি বলেছিল, তোমার সঙ্গে আমি গাছতলাতেও থাকতে রাজি আছি।

গাছতলায় ওরা থাকেনি। বাবা মারা যাবার পরেই শুভংকর স্কুলের চাকরি ছেড়ে চলে আসে কলকাতায়। আর কিছু না, আত্মীয়স্বজনরা ঠকিয়ে সম্পত্তিগুলো

নিতে চাইছে বলেই তাদের জব্দ করার জন্য মামলা ঠুকতে হয়। এবং জেতে। কারণ সে ন্যায্য উত্তরাধিকারী।

সেদিন একজন পরিচিত লোক এসে বললেন, বাজারে বেবিফুড একদম পাওয়া যাচ্ছে না। দারুণ বিপদে পড়েছি। শুভংকর রায় তো আপনার বন্ধু ছিল, ওর দোকানে পাওয়া যেতে পারে, আপনি আমাকে একটা ব্যবস্থা করে দিন না।

বড়বাজারে শুভংকরদের এই ব্যাবসার কথা আমি জানতাম না। নাছোড়াবান্দা ভদ্রলোককে নিয়ে সেখানে যেতেই হলো। শুভংকর এখন এক হাতে দুটো আংটি পরে। শরবত খাইয়ে আপ্যায়ন করল।

সমস্ত বেবি ফুডের ব্যবসায়ীই চোরা কারবার করে কিনা সে সম্পর্কে আমি জোর করে কিছু বলতে পারি না। না হতেই পারে। কিন্তু দোকানে বেবি ফুড না থাকা সত্ত্বেও শুভংকর পুরোনো বন্ধুকে খাতির করার জন্য এক টিন আমাদের যোগাড় করে দিয়েছিল। কৃতজ্ঞ হবার বদলে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে ওর নামে ক্ষীণ সমালোচনা করতে থাকি।

সেই সময়েই মনে পড়ে, একটি শিশু যতদিন পয়সা গুণতে শেখে না, ততদিনই সে সত্যিকারের সরল থাকে। তারপর স্কুলে অঙ্ক শেখার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘড়ির কাঁটা চেনে ও পয়সা গুণতে শিখে যায়, আর পাকা হয়ে ওঠে। এই অঙ্কই যত নষ্টের গোড়া।

ডাকাতের ছেলে অনেক সময় বড়ো ডাকাত হয়। বারবনিতার মেয়ে বারবনিতা। গায়কের ছেলে গায়ক, ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার। পৃথিবীতে এই রকম একটা নিয়ম আছে। কিন্তু কেরানির ছেলে কি কেরানি হতে চায়? করপোরেশন অফিসে টিকে দেন যাঁরা, তাদের ছেলেমেয়েদেরও কি তারা ওই পদে চাকরির জন্য তৈরি করেন? একজন স্কুল মাস্টারের দুঃখিনী স্ত্রী তাঁর বড়ো ছেলেকে বলেছিলেন, আর যদি কোনো কাজ না পাস তাহলে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের বাইরে লোকজনের জুতো দেখাশুনোর কাজ করবি। তবু মাস্টারিতে ঢুকিস না।

কলকাতার বড়ো বড়ো হোটেলে একটা বিকৃত বীভৎস চাকরির পদ আছে। বাথরুমের দরজার পাশে একজন লোক বসে থাকে, যার কাজ হচ্ছে বাবু ও মাতালদের দেখে সেলাম করা এবং সসম্ভ্রমে দরজাটা খুলে ধরা। অর্থাৎ ঘন্টার পর ঘন্টা ঐ লোকটি বাথরুমের ভেতরে বা বাইরে বসে থাকবে। কোনকালে ব্রিটিশরা হয়তো এ দেশের নেটিভদের দিয়ে এ রকম কাজ করিয়ে নিত। এখন স্বদেশী আমলেও সে কাজ সগৌরবে চলছে।

এ-রকম একজন লোককে দেখে আমার অসহ্য বোধ হয়েছিল। আমি লোকটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার নাম কি?

সে এমনই মিনমিন করে কথা বলে যে বোঝাই যায় না। বাবুদের সামনে স্পষ্ট করে কথা বলার অভ্যেসই ওর নেই। দু'-তিন বার জিজ্ঞেস করার পর জানতে পারলাম, ওর নাম শাজাহান।

একমুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। যদিও নামে কিছু আসে যায় না, তবু শাজাহান নামটা শুনলে একটু রোমাঞ্চই হয়। ওর বাবা-মা যখন এই নাম রেখেছিল, তখন নিশ্চয়ই অনেক শখ ও স্বপ্ন ছিল ছেলেকে ঘিরে। আরো কয়েকটা প্রশ্ন করে জানতে পারলাম, ওর বাড়ি ছিল উত্তরপ্রদেশের কি একটা গ্রামে। একবার বন্যায় বাড়িঘর সব ডুবে যায়। তারপর ভাসতে ভাসতে নানা ঘাটের জল খেয়ে এখানে এসে ঠেকেছে।

ঈষৎ ঘোরের মাথায় আমি ওকে জিজ্ঞেস করি, জীবনে কি হতে চেয়েছিলে শাজাহান?

ও মাথা নীচু করে থাকে। মৃদু মৃদু হাসে। হয়তো ও জানেই না, এ ছাড়া জীবন আবার কি রকম। তবু, চাষীর ছেলে যখন, নিশ্চয়ই বাথরুমের দরজা পাহারা দেবার চাকরির কথা কখনো ভাবেনি।

সার্থক মানুষরা মারা যাবার পর খবরের কাগজে যখন তাদের জীবনী পড়ি, তখন চমৎকৃত হয়ে যাই। এঁরা সার্থকতার সিঁড়ির ধাপে ধাপে উঠে এসেছেন। কোথাও হিসেবের গরমিল নেই। দৈবাৎ শুধু দু'-একটি মুচির ছেলে জোসেফ স্টালিন হয় কিংবা পুলিশের ছেলে হয় বিপ্লবী। আমার চেনাজানা জগতে যাদের দেখি, তারা অনেকেই যা হতে চেয়েছিল, তা হয়নি।

আমি নিজেও কখনো লেখক হতে চাইনি। আমার ইচ্ছে ছিল নাবিক হওয়ার। কিংবা জাহাজের ডাক্তার। জল আমার বড়ো প্রিয়, সারাজীবন সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে আমি রাজি ছিলাম। তা আর হলো না। ঠিক মতন লেখকও হতে পারলাম না। সত্যিকারের সার্থক লেখা এখনো কত—কত দূরে। কোনো কোনো সন্ধেবেলার আবছা আলোয় একলা-একলা হাঁটতে হাঁটতে আমারও মনে হয়, এ জীবন অন্য রকম হবার কথা ছিল।

পুরাতন ভৃত্য

আমার ছোটমাসিদের বাড়ির চাকর হরিদাসকে নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখে ফেলা যায়। সে একটি মূর্তিমান জলজ্যান্ত 'পুরাতন ভৃত্য'। হরিদাসকে নিয়ে আমার ছোটমাসিদের অভিযোগের অন্ত নেই। যেসব মানুষকে দেখলে মনে হয় বয়েসের

গাছপাথর নেই, হরিদাসের চেহারাটা সেইরকম, অর্থাৎ তার বয়েস পঁয়তাল্লিশও হতে পারে, পঁয়ষট্টিও হতে পারে—আমরা অনেক দিন থেকেই তার একই রকমের চেহারা দেখছি। আরশোলার মতন গায়ের রং, একটু কুঁজো হয়ে হাঁটে। মুখখানা সব সময় হাসি-হাসি। সে অলস। বোকা এবং চোর। তবু সৎ।

চোর অথচ সৎ—একথা শুনলে আশ্চর্য মনে হতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিকই। তার চুরির মধ্যে একটা সততা আছে। যেমন, হরিদাস রান্নাঘর থেকে মাছভাজা কিংবা দুধের কড়াই থেকে দুধ চুরি করে খায়। কিন্তু কক্ষনো টাকাপয়সা কিংবা অন্য কোনো দামী জিনিস চুরি করেনি। বহু হারানো গয়না সে খুঁজে দিয়েছে, ঘর ঝাঁট দেবার সময় খুচরো পাঁচ-দশ পয়সা পেলেও সে ছোটমাসির হাতে তুলে দেয় কিন্তু মাছ ভাজা সম্পর্কে বেড়ালের চেয়েও বেশি লোভ। এবং এ সম্পর্কে সে অম্লানবদনে মিথ্যে কথা বলে।

দুধ চুরিটা আবার অন্য রকম। আজকাল কারোর বাড়িতেই অঢেল পরিমাণে দুধ থাকে না। সুতরাং দুধ কম পড়লে নজরে আসবেই। হরিদাসের কড়া পাহারায় ছোটমাসিদের বাড়িতে বেড়াল ঢোকার উপায় নেই। বেড়াল সে অত্যন্ত ঘৃণা করে। দুধ চুরি করার পর ধরা পড়লেই হরিদাস সে কথা স্বীকার করতেও দ্বিধা করে না। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সে বলে যে সে সামান্য একটু দুধ ঢেলে নিয়েছে নিজের গেলাসে। অন্য বাড়ির চাকরদের মতন সে কক্ষনো দুধের কড়াই থেকেই চুমুক দিয়ে খায় না। বাবুদের দুধ সে এঁটো করে দেবে না কক্ষনো।

দুধ চুরি করিস কেন রে হারামজাদা?

এ প্রশ্নের উত্তরে সে বিগলিত হাস্যে বলে যে বছরে দু'-তিন দিন দুধ না খেলে নাকি মানুষের কুকুর-রুচি হয়ে যায়। তখন জিভটা বের করে হ্যা হ্যা করতে হয়।

কয়েকবার এই রকম করায় ছোটমাসিরা হরিদাসের জন্য বাধ্য হয়েই খানিকটা দুধ বরাদ্দ করেছেন।

মেয়েদের মাথায় মাখার গন্ধতেল চুরি করার দিকেও ঝোঁক আছে হরিদাসের। একবার আবিষ্কার করা হয়েছিল, সে একটা ছোট শিশিতে ঐ চুরি করা তেল জমিয়ে রাখে। বোধহয় ওর বৌকে পাঠাবার জন্য। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত হাসাহাসির পর্যায়েই ঠেকেছিল।

কিন্তু এক এক সময় হরিদাসের ব্যবহার একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠে। জরুরি কাজে দোকানে কিছু কিনতে পাঠালে দেড় ঘণ্টা বাদে ফেরা। পাশের বাড়ির লোকের সঙ্গে অনর্থক ঝগড়া বাধানো—এছাড়া দামী-দামী জিনিসপত্র ভাঙা তো আছেই। দরকারি কাগজ বা চিঠিপত্র ঝাঁট দিয়ে বাইরে ফেলে দেবার ব্যাপারে তার জুড়ি নেই।

প্রায়ই হরিদাসকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। কখনো কখনো সে নিজেই রাগ করে চলে যায়। বেশি বকাঝকা করলে সে বলে, আমি আজই চলে যাচ্ছি, পরের গোলামি আর করব না। দেশে গিয়ে চাষবাস করব। আমার কি তিনকূলে কেউ নেই নাকি?

আমার ছোটমাসি তখন বলেন, যাও, এক্ষুনি বিদেয় হও। আর কোনোদিন মুখ দেখতে চাই না তোমার! সেও তৎক্ষণাৎ তার জামাকাপড়ের পুটলিটা বগলদাবা করে শিয়ালদা স্টেশনের দিকে রওনা দেয়।

কি কি কারণে হরিদাসের চাকরি যায়, তারই সামান্য একটা নমুনা দিচ্ছি। একদিন ছোটমাসিরা নাইট শোতে সিনেমায় গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন, তাদের শোবার ঘরের বিছানায় হরিদাস দিব্যি শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

বাড়ির বাবুদের অনুপস্থিতিতে ঝি-চাকররা যতখুশি ফ্যানের হাওয়া খায়, অনেকখানি চিনি দিয়ে নিজেদের জন্য চা বানায়। বড়জোর চেয়ারে বা সোফায় বসে। তা বলে বিছানায় শোওয়াটা কি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি নয়? দেখলে তো গা রি-রি করে উঠবেই।

ছোটমাসি চেঁচামেচি করে একটা তুলুল কাণ্ড বাধিয়ে তুললেন। তক্ষুনি বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় সব বদলাতে হলো। এই সময় হরিদাস যদি কাঁচুমাচু হয়ে ক্ষমা চাইত, তাহলে ব্যাপারটা মিটে যেতে পারত। কিন্তু ক্ষমা চাওয়া তার ধাতে নেই। তার উল্টোটা আরো মর্মপীড়াদায়ক।

সে মিটিমিটি হেসে বললে, বিছানা করতে করতে ঘুম এসে গিয়েছিল গো বৌদি! এরকম নরম বিছানায় তো কখনো শুইনি। কি যে আরাম জীবনে যদি একবার না বুঝলাম—

একথা শুনে ছোটমাসি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, তুমি বিদায় হও, আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না কোনোদিন—

হরিদাস তক্ষুনি তেজের সঙ্গে বলল, আমাকে তাইড়ে দেচ্ছেন! আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।

কিন্তু মাঝরাত্তিরে কারুকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না, ছোটমাসি বললেন, থাক, এখন গিয়ে আর গৃহস্থের অকল্যাণ করতে হবে না। কাল সকালেই তুমি বিদায় হবে।

সকালেই হরিদাস মাইনেপত্র বুঝে নিয়ে বিদায় হয়ে গেল। কিন্তু পুরাতন ভৃত্যকে কখনো বিদায় করা যায় না। ও বাড়ির সকলেই জানে, হরিদাস ঠিক পনেরো-কুড়িদিন বাদে আবার ফিরে আসবে। এরকম অনেকবার হয়েছে। সে ফিরে আসার পর যখন তাকে বলা হয়েছে যে, তোমাকে এবার রাখা হবে না।

BDeBooks.com

তখন সে উত্তর দিয়েছে, না রাখবেন তো না রাখবেন, তা বলে কি দুটো খেতেও দেবেন না! আমি কি না খেয়ে থাকব নাকি?

হরিদাসের একটি মাত্র গুণ সে বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসে। ছোটরাও ওর ভক্ত, ও ফিরে এলে তারা খুশি হয়। সেইজন্যই ওকে আর তাড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হরিদাস ছোটদের নানা রকম গল্প বলে। সে একটু-আধটু লেখাপড়া জানে মনে হয়। রামায়ণ মহাভারতের অনেক গল্পই তার কণ্ঠস্থ। সে নাকি এককালে যাত্রাদলে গান গাইত, যদিও কথাটা বিশ্বাস করা যায় না, কারণ তার কণ্ঠস্বর যথেষ্ট খারাপ। যে-সব পরিশ্রমী মানুষ পৃথিবীতে লাঙল-চালিয়ে ফসল কিংবা নদীতে ঘুরে ঘুরে মাছ ধরে বা মাটি কাটে বা বাড়ি বানায়—হরিদাস ঠিক সে দলের নয়। তার স্বভাবটাই অনেকটা দার্শনিক বা শিল্পীর মতন, যদিও সে-রকম কোনো যোগ্যতা তার নেই। এই এক ধরনের অদ্ভুত মানুষ থাকে! দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক গ্রামে তার বৌ ছেলেপুলে আছে। হরিদাস আগে গ্রামের যাত্রাদলের টুকিটাকি কাজ করে চালাত, তারপর শহরে এসেছে চাকরের কাজ করতে। সে নাকি একদম খিদে সহ্য করতে পারে না। বাবুদের বাড়িতে কাজ করলে আর যাই হোক, দু'বেলা পেট ভরে ভাত-রুটি অন্তত পাওয়া যায়।

হরিদাসের শেষতম কীর্তির সাক্ষী ছিলাম আমি। সেদিন ছোটমাসির বাড়িতে গেছি, বসবার ঘরে গল্প জমেছে এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে একটা কোলাহল শোনা গেল। ছোটমাসিদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও ভেতরে গেলাম। দেখলাম, হরিদাস আর একটা কাণ্ড বাধিয়েছে। কাজের থেকে অকাজেই তার প্রতিভা ভালো খোলে।

রান্নাঘরের কলটা খারাপ বলে, বাড়ির রাধুনি ডেকচিতে করে চাল নিয়ে এসেছিল উঠোনের বাথরুমের কলে ধোওয়ার জন্য। ধোওয়ার পর সে ডেকচিটা বারান্দার ওপর একটুখানি রেখে কোথায় যেন গেছে। এমন সময় সেখানে হরিদাসের আবির্ভাব। তাকে বলে বলেই কাজ করানো যায় না। অথচ এখন তার নিজে থেকেই কাজ করার স্পৃহা জাগল। চাল ধোওয়ার পর ওপরে যে জলটুকু থাকে সেটা ময়লা দেখায়। হরিদাস বলল, 'এখানে আবার ডেকচিতে ময়লা জল রাখল কে,' বলেই সে ডেকচির ভেতরের সব ছুঁড়ে দিল নর্দমার দিকে।

এই বাজারে দেড় কিলো চাল নষ্ট হলে কার না রাগ হয়। বৃষ্টির মতন অবিরাম ভর্ৎসনা ও গালাগালি বর্ষিত হতে লাগল তার ওপরে। হরিদাস কিছুক্ষণ পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ এগোতে লাগল নর্দমার দিকে। তখন আবার সকলে হৈ-হৈ করে নিষেধ করতে লাগল। নর্দমা থেকে চাল তুলে খাবার মতন অবস্থা এখনো শহরের গৃহস্থদের হয়নি।

হরিদাস তবু একটা জন্তুর মতন হুমড়ি খেয়ে পড়ল নর্দমার ওপরে। দু'হাতে চালগুলো ভরে নিতে লাগল নিজের কোঁচড়ে।

আমিও এক ধমক দিয়ে বললাম, এই হরিদাস, ওটা কি হচ্ছে?

হরিদাস মুখ ফিরিয়ে সজল চোখে বলল, দাদাবাবু, দেশে আমার বৌ ছেলেমেয়েরা আধপেটা খেয়ে থাকে। আমি এতখানি চাল নষ্ট করলে আমার পাপ হবে গো, খুব পাপ হবে। সেই পাপে তারা নিশ্চয়ই না খেয়ে মরে যাবে।

আমরা দু'-এক মিনিট সকলে চুপ করে রইলাম। কোনো কথা খুঁজে পেলাম না।

ফুলেশ্বর

মনে করুন ছুটির দিনে আপনি অনেকের সঙ্গে দল বেঁধে পিকনিকে বেরিয়েছেন। বছরে এক-আধবার এরকম তো ইচ্ছে করেই। বিশেষত শীতকালে। কোথায় যাবেন? এখানে কলকাতার নাগরিকদের কথাই বলছি—যাঁরা কলকাতার বাইরে থাকেন, তাঁদের অন্যান্য অনেক সমস্যা থাকলেও এখনো জায়গাব সমস্যা হয়নি। কলকাতার মানুষ এরকম কোনো পিকনিকের কথা ভাবলেই প্রথমে মনে পড়বে বোটানিকাল গার্ডেনস বা চিড়িয়াখানার কথা। এক লক্ষ লোক একসঙ্গে ঐ দুটি জায়গার কথা ভাববে, সুতরাং ওখানে ভিড় হবে লাখো মানুষের। অত ভিড়ের মধ্যে কি পিকনিক জমে?

যারা একটু দূরে যেতে রাজি আছেন, তাঁদের মনে পড়ে ডায়মণ্ডহারবারের কথা। অন্তত পঞ্চাশ হাজার মানুষেব একসঙ্গে মনে পড়ে। যে-কোনো ছুটির দিনেই ডায়মণ্ডহারবারে দারুণ ভিড়।

ভিড়ের শহর কলকাতার মানুষ স্বভাবতই এই সব বিশেষ দিনে একটু নিবিবিলি চায়। কিন্তু নির্জনতাই এখানে সবচেয়ে দুর্লভ সামগ্রী।

এইরকম একটা দলের সঙ্গে এবার বেরিয়েছিলাম ইংরেজি নববর্ষের দিনে। কোথায় যাওয়া যায়, কোথায় যাওয়া যায়? ভিড়ের জায়গা কারুরই মনঃপূত হয় না। শহর থেকে বেরিয়ে রাস্তার ধারে যে-কোনো একটা জায়গায় বসে পড়া যেতে পারে বটে ; কিন্তু সেখানে আছে পানীয় জলের সমস্যা। যে-কোনো জায়গার জল কি আজকাল বিনা দ্বিধায় পান করা যায়? তাছাড়া, বড়ো রাস্তার ধারগুলি হচ্ছে স্থানীয় লোকদের বড়ো-বাথরুমের বারোয়ারি জায়গা। সকালবেলা ট্রেনে যেতে যেতে অনেকেই সে দৃশ্য দেখেছেন।

অনেক ভেবে-চিন্তে হঠাৎ একটা জায়গার নাম আমার মনে পড়ল। এক সময় ফুলেশ্বর বলে একটা জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম, বেশি দূরে নয়, হাওড়া জেলায়। সেখানে গঙ্গানদী বাঁক নিয়ে বিশাল চওড়া হয়েছে, নয়নাভিরাম দৃশ্য। সেই দৃশ্যের কিনারায় সেচ বিভাগের একটি চমৎকার বাংলো, বাংলোর সামনে প্রশস্ত চত্বর।

আমার মনে হলো, স্থানটি আমাদের পক্ষে আদর্শ হবে। সুন্দর প্রকৃতি এবং নিরিবিলি। প্রধান সড়ক থেকে আবার অনেকখানি সরু রাস্তা ধরে যেতে হয়। গাড়িচালকরা উৎসাহী হবেন না। ফুলেশ্বর নামে একটি রেল স্টেশনও আছে, স্টেশন থেকে গঙ্গার ধার পর্যন্ত হাঁটা পথ। আমি দলের সকলকে সেখানে যাবার জন্য উৎসাহী করে তুললাম।

গিয়ে কি দেখলাম? সেই অগম্য স্থানটিও মানুষের ভিড়ে গমগম করছে, ঝনঝন করে বাজছে মাইক্রোফোন। অর্থাৎ সেদিন সেখানকার জনসংখ্যা প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ইন্দোনেশিয়ার সমান। যেদিকে চোখ যায়—সেদিকেই জ্বলছে উনুন। মুরগি কাটা হচ্ছে কিংবা পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কান্নাকাটি করছে অনেকে।

আমাদের দলের সকলেরই মন দমে গেল। কিন্তু অতদূরে একবার পৌঁছে আবার তক্ষুনি ফিরে আসা যায় না। অনেক চেষ্টা করে খানিকটা জায়গা খুঁজে বার করতেই হলো। আমি বহু বছর দুর্গাপূজার সময় কলকাতায় থাকিনি—সুতরাং কোনো বারোয়ারি উৎসবের স্বাদ এখানেই অনেকদিন বাদে টের পেলাম। বারোয়ারি পিকনিক।

সুন্দর সুন্দর জায়গা চিনে নেবার চোখ ছিল সাহেবদের। আমাদের দেশের অধিকাংশ শৈলনগরীই যেমন সাহেবদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, এছাড়াও নানা জায়গায় যে-সব ডাকবাংলো দেখে এমন আমরা মোহিত হই সেগুলিও অধিকাংশই সাহেবী আমলে তৈরি। আমি ঠিক জানি না, ফুলেশ্বরের ঐ ডাকবাংলোর জন্য স্থান নির্বাচনও সাহেবী আমলেই হয়েছে কিনা। সাহেবরা অবশ্য স্বার্থপরের মতন ঐ সব সুন্দর জায়গা প্রায় নিজেদের ব্যবহারের জন্যই সুরক্ষিত রাখত। এখন বারোয়ারি আমলে আমরা সেগুলো নষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছি।

নিরিবিলি জায়গার যখন অভাব, তখন সুদৃশ্য জায়গাগুলিতে তো ভিড় হবেই। যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় ন'জন। কিন্তু অচেনা মানুষ হলেই যেন আমরা প্রথম থেকেই পরস্পরকে অপছন্দ করা শুরু করি।

তরুণ বয়েসী ছেলেদের হুল্লোড় দেখতে আমার ভালো লাগে। পিকনিকে গিয়ে অনেকেই কিছুটা মুক্ত হয়। রস-রসিকতার ছড়াছড়ি একটু বেশি মাত্রায়

হলেও আপত্তি করার বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু আমাদের রসিকতাজ্ঞান আজকাল নিছক গালাগালিতে পর্যবসিত হয়েছে। এতগুলি উচ্ছল প্রাণের মাঝখানে এসে আশা করেছিলাম কিছু নতুন রসিকতা শুনতে পাব, কান পেতে ছিলাম। কানে এল কিছু কাঁচা গালাগালি—একটাও নতুন নয়, সবই আগে শোনা। এমনকি ছাপার অক্ষরেও বেরিয়ে গেছে পর্যন্ত।

আর একটা ব্যাপার সত্যিই ভারী অদ্ভুত। দুর্গাপুজো কালীপুজোয় মাইকের উৎপাত নিয়ে অনেকে অনেককিছু বলেছেন। কিন্তু পিকনিকেও যে মাইক বাজানো হয় তা আমার ধারণাই ছিল না। ফুলেশ্বরের পিকনিক ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরো মজার। মাঠের দু'পাশ থেকে দুই মাইক্রোফোনে তারস্বরে গানের রেকর্ড বাজানো হচ্ছে—দুটি আলাদা গান, তার ফলে কোনো গানেরই সুর বা কথা কিছুই বোঝার উপায় নেই। শোনা যাচ্ছে শুধু একটা বিকট শব্দ।

চিন্তা করতে লাগলুম, এখানে গান বাজাবার কারণটা কি হতে পারে? সঙ্গীতপ্রীতি? সঙ্গীত সম্পর্কে যার সামান্য আগ্রহ আছে, তার পক্ষে ঐ বিকট আওয়াজ এক মিনিটও সহ্য করা সম্ভব নয়। পিকনিকে এসে একটু গান বাজনা হলে সকলেরই ভালো লাগে। দলবল মিলে কোরাস গাইলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? এরকম একটা রেওয়াজ কি আগে ছিল না? পিকনিক ক্ষেত্র তো সঙ্গীত সম্মেলন নয়, সেখানে একটু ভুল সুরে, একটু বেসুরো গলায় গানও মানিয়ে যায়। ঐ বিরাট জনসমাগমে একটি দলকেও দেখলাম না, যাঁরা নিজেরা মিলেমিশে গান গাইছেন।

বোঝা গেল, দুটি আলাদা পিকনিক দল মাইক্রোফোন ও রেকর্ড সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। নিজেদের কণ্ঠসঙ্গীতের প্রতি তাদের আস্থা নেই। লতা মুঙ্গেশকার, রফি কিংবা আশা ভোঁসলে প্রমুখের গান না শুনলে তাদের তৃপ্তি হবে না। সুতরাং পিকনিকের বাজেট ঠিক করার সময় চাল, মুরগি, আলু-বেগুনের সঙ্গে সঙ্গে মাইক ভাড়াও ধরা হয়েছিল। এ পর্যন্ত না হয় বোঝা গেল। কিন্তু তারপর পিকনিক স্পটে এসে যখন দেখা গেল, দু'দল এরকম দুটি মাইক এনেছে—তখন একদল নিজেদেরটা বন্ধ রেখে অন্যদলের গানটা শুনলেই বা ক্ষতি ছিল কি? দু'দলেরই হিন্দী গান ছাড়া অন্য কিছু নেই। সুতরাং রুচির অমিল হবারও বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। দু'দল মিলেমিশে রেকর্ডগুলো বদলাবদলি করে বাজালে ক্ষতি ছিল কি? কিন্তু অচেনা দল মানেই যেন পরস্পরের শত্রু। সুতরাং একশো গজের মধ্যে দুটি মুখোমুখি মাইক্রোফোনে বিকট নিনাদ। মুখ দেখে মনে হলো না, কারুর কোনো অসুবিধা হচ্ছে, ঐ আওয়াজেই যেন তাদের সঙ্গীত-পিপাসা মিটে যাচ্ছে। এর পরের পিকনিকে ওরা তিনটে ধোপার গাধা ভাড়া করে নিয়ে গিয়ে তাদের মুখ

দিয়ে অনবরত আওয়াজ বার করলে অনেক কম খরচে হয়ে যাবে, গানের ব্যাপারটাও ঠিক থাকবে।

একটি মাত্র টিউবওয়েল, সেখান থেকেই খাবার জল নেওয়া ও মুখ ধোওয়া। ভিড় তো হবেই। সর্বক্ষণ ভিড়। ছেলেরা হৈ-হৈ করে সেখানে জল ভরছে কিংবা মুখ ধুচ্ছে। গুটিকয়েক মেয়ে একদিকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে। তাদের হাতের এঁটো শুকিয়ে আসছে। মেয়েদের দেখলে একটু জায়গা ছেড়ে দেবার একটা যেন নিয়ম এককালে ছিল মনে পড়ছে। এখন স্পষ্টতই সে নিয়ম উঠে গেছে। মেয়েরা বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে বেশিক্ষণ তাদের উদ্দেশ্যে বাক্যবাণ নিক্ষেপ করা যায়। মেয়েদের প্রতি বাক্যবাণ নিক্ষেপ করার বদলে তাদের সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা কিন্তু কেউই করে না। একজন ছেলেও তো কোনো অচেনা মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল না, আসুন, আপনি হাত ধুয়ে নিন না, আমি পাম্প করে দিচ্ছি। জল পাম্প করে দিতে দিতে সে অনায়াসেই প্রশ্ন করতে পারত, আপনি কোথা থেকে আসছেন। আপনার নাম কি? এইসব সরল প্রশ্নে ভূ-ভারতে কেউ কখনো আপত্তি জানায়নি। অচেনা মেয়ের সঙ্গে সামনাসামনি দু'চারটি কথা বলার বদলে পিছন থেকে দু'একটা কু-বাক্য ছুঁড়ে দেওয়ার আনন্দ যে কি করে বেশি হয় তা বোঝার সাধ্য আমার নেই। আমি সত্যিই বারোয়ারি উৎসবের নিয়ম জানি না।

গোপন কথা

আমার একটা গোপন কথা আছে, সেটা কাকে বলব? সেই মানুষটাকে খুঁজে পাওয়াই সব চেয়ে শক্ত।

পৃথিবীতে এমন কে আছে, যার কোনো গোপন কথা কিংবা খুব গোপন কোনো সমস্যা নেই? এই গোপনীয়তার ভার মানুষ কিছুতেই একা বইতে পারে না। কারুকে না কারুকে বলতেই হয়। বুকের মধ্যে অসহ্য ভার হয়ে থাকে—অন্য একজন কারুর কাছে প্রকাশ না করা পর্যন্ত তার মুক্তি নেই।

আগেকার দিনে আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠাকুরঘরে কাটাতেন, তার কারণ কি শুধু ভক্তি? বর্ষীয়সী বৃদ্ধারা সমাজের অবধারিত নিয়মে ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন, তাঁদেরও তো গোপন কথা থাকে। শেষ পর্যন্ত পাথরের ঠাকুরের সামনেই সেই গোপনীয়তার মুক্তি। 'ঠাকুর তুমি তো জানো আমার মনের কথা'—এই যে আকুল আবেদন, এর পেছনে অনুচ্চারিত থাকে সেই দুঃখ—আমাকে কেউ বুঝলো না—যারা আমার চার পাশে বেঁচে আছে, তারা আমার মনের কথা

বোঝবারও চেষ্টা করে না।

সন্ন্যাসী কিংবা গুরুঠাকুরদের কাছে ভিড় করারও কারণ তাই। ঐ সন্ন্যাসী কিংবা গুরু একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি যিনি পরের দুঃখ ঘুচিয়ে দেবারই ব্রত নিয়েছেন, তাঁর কাছে গিয়েই সব কিছু উজাড় করে ফেলা যায়। সেই জন্যই যে গুরু ভক্ত বা ভক্তিমতীদের মনের কথা যত তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলেন, তিনি তত জনপ্রিয়।

শিষ্য ঘরে ঢোকা মাত্রই গুরু যদি বলেন, কি রে, তোর মনে এত চিন্তা কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে! তক্ষুনি শিষ্যর মনে হয় গুরু অন্তর্যামী। আর কেউ তো আমার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় না, আর কেউ তো আমার মুখের দিকে তাকিয়েই বোঝে না আমাব মনের মধ্যে ঝড় বইছে! চোখে জল এসে যায় এই জন্য।

আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান বলে যে মানুষের অধিকাংশ অসুখই মানসিক। গেটের অসুখ থেকে শুরু করে অনেক চর্মরোগ পর্যন্ত স্রেফ মানসিক অশান্তির জন্যই হয়। থ্রমবসিস ইত্যাদিও তো অতিরিক্ত চিন্তার ফল। কোনো দিন যদি শোনা যায় যে, ক্যানসার রোগও মানসিক যন্ত্রণারই কু-ফসল—তা হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

ডাক্তারদের কাছে যাবার পর আমাদের অনেক অসুখ সেরে যায়। তার কতটা ওষুধ খাবার জন্য আর কতটা যে ডাক্তারের কাছে সব কিছু খুলে বলার পর ভিতরের অবরুদ্ধ বাষ্পের মুক্তির জন্য তা এখনো নির্ধারিত হয়নি। তবে অনেক সময়ই দেখা গেছে অনেক সহৃদয় ডাক্তারের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা করার পর, তাঁর দেওয়া ওষুধটির প্রথম দাগ খেয়েই উপকার হতে শুরু করেছে।

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের কৃতিত্ব এই ক্ষেত্রে আরো বেশি। হোমিওপ্যাথি ওষুধের বিজ্ঞানের দিকটা আজও আমাদের অনেকের কাছে স্পষ্ট নয়। তবে সব হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার একটা পদ্ধতি অবলম্বন করেন—তাঁরা রোগীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করেন। আপনার কোন গ্রামে জন্ম, সেই গ্রামের উত্তর কোণে একটা শিমুল গাছ ছিল কি না, সেই শিমুল গাছে শকুনের বাসা ছিল কি না —এই রকম প্রশ্নও করা হয় বলে অনেকে ঠাট্টা ইয়ারকি করে থাকেন। কিন্তু এই উপলক্ষে রোগী তার যত কিছু বলার আছে, সবই খুলে বলার মতন একজন লোককে অন্তত পায়।

যাদের অসুখের বাতিক আছে, যারা অনবরত অসুখের কথা বললে অন্যরা বিরক্ত হয়, তাদের কথা যে ডাক্তারেরা ধৈর্য ধরে শোনেন, যত আজেবাজে

উপসর্গের কথাও ধৈর্য ধরে শোনেন, তিনিই ওর ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক।

উকিল-ব্যারিস্টারদের কাছেও অনেকে গোপন কথা খুলে বলতে পারেন বটে। মামলার কারণে বলতেই হয়। কিন্তু উকিল-ব্যরিস্টারদের সঙ্গে টাকাপয়সার সম্পর্কটা বড়ো বেশি প্রকট বলেই এখানে সান্ত্বনা একটু কম। তা ছাড়া, এ কথাও মনে হয়, উকিলরা বেশি টাকা পেলে প্রতিপক্ষের কথাও এ-রকমভাবেই শুনতেন —সুতরাং উনি ঠিক আমারই প্রতি সমব্যথী নন। ডাক্তার বা সাধু-সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে এই প্রতিপক্ষের ব্যাপারটা নেই।

প্রেম জিনিসটা কি? অনেকেই এই প্রশ্ন করেন। বিশেষত যাঁরা প্রেমে পড়েন নি। তাঁরা অহরহই অন্যকে জিজ্ঞেস করে থাকেন, আচ্ছা, তোমরা যে এত প্রেম প্রেম করো—প্রেম জিনিসটা আসলে কি তা বলতে পার?

এ পর্যন্ত ব্রহ্ম এবং প্রেম—এই দুটি জিনিসের সঠিক কোনো ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারেনি। রামকৃষ্ণ বলেছেন, ব্রহ্ম অনুদ্দিষ্ট। আর কবি-সাহিত্যিকরা বার বার বলে গেছেন, যে কখনো প্রেমে পড়েনি, সে কখনো প্রেমের স্বাদ বুঝবে না।

তবু, প্রেম ব্যাপারটার খুব প্রাথমিক একটি শর্তের কথা বলা যেতে পারে। যাকে সমস্ত গোপন কথা খুলে বলা যেতে পারে—তার সঙ্গেই সত্যিকারের প্রেম হতে পারে। আমরা অনেক সময় বাইরে থেকে দেখি যে প্রেমিক-প্রেমিকারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কি সব মাথামুণ্ডহীন কথা যে বলে যাচ্ছে, তার ঠিক নেই। ঐ সব আবোল-তাবোল কথা বলেও আনন্দ পাচ্ছে বলেই তো ওরা প্রেমিক-প্রেমিকা। প্রেমের সঙ্গে শরীরেরও একটা সম্পর্ক আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু মাসের পর মাস প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরের সঙ্গে দেখা নেই—শবীরের কাছে নেই শরীর, তবু তো হাজার-হাজার চিঠি-বিনিময় হয়। এক হাজার মাইল দূর থেকেও হঠাৎ মনে হয় একবার টেলিফোনে কথা বলতে।

সুতরাং মনে হতে পারে, মানুষের সব গোপন কথা বলা যেতে পারে একমাত্র প্রেমিককেই। কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরের সম্পর্কেই যদি কোনো গোপন কথা থাকে? এ-রকম কি থাকে না? ভালোবাসার দুঃখ অনেক। একজন মানুষ তার প্রেমিকাকে আর সব কথাই খুলে বলতে পারে—কিন্তু যদি প্রেমিকা সম্পর্কেই কোনো ঈর্ষা বা ভয়ের ব্যাপার থাকে কখনো—সেটা কিছুতেই বলতে পারে না। একটু স্থূল স্বভাবের লোকরা অবশ্য ঐসব কথা নিয়েও ঝগড়া করে। কিন্তু সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন কোনো মানুষ, অর্থাৎ খাঁটি কোনো প্রেমিক পারে না কারুকেই বলতে, তার গোপন কথা বলার জন্য আর কেউ নেই। সেই সময় তার মতন নিঃসঙ্গ, তার মতন দুঃখী মানুষ পৃথিবীতে আর একজনও পাওয়া যাবে না।

ভোরের স্টেশন

ঘুম ভাঙার পর ট্রেনের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, ভোর হয়ে এসেছে এবং একটা স্টেশনে ট্রেন থেমে আছে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো, ট্রেনটা এখানে থেমে আছে অনেকক্ষণ। এই ছোট স্টেশনে মেল ট্রেন থামারই কথা ছিল না। কিন্তু ট্রেনের একটা আলাদা জীবন আছে, ইচ্ছে-অনিচ্ছে আছে, কখন সে চলবে বা থামবে, তা সে নিজেই ঠিক করবে। সব সময় যে রুটিন মেনে চলতেই হবে, তার কোনো মানে নেই।

কাছাকাছি কোনো চা-ওয়ালা দেখতে পেলাম না। ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই চায়ের কথা মনে পড়ে। এবং চা না খেয়ে দিনের প্রথম সিগারেটটি আমি ধরাতে পারি না। কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে আমি আড়মোড়া ভাঙলাম।

মেল ট্রেনটির চেহারা খুব গম্ভীর মনে হলো। যেন তার খুব মন খারাপ। এখন তার দৌড়োদৌড়ি করার একটুও ইচ্ছে নেই। তাতে অবশ্য আমার কিছুই যায় আসে না, আমার কোনো ব্যস্ততা নেই পৌঁছোবার। সারা জীবন আমি কখনোই কোনো গন্তব্যস্থলে পৌঁছোবার জন্য ব্যস্ততা অনুভব করিনি, যাত্রাপথটাই আমার কাছে বেশি উপভোগ্য। যারা সবসময়ই কোথাও-না-কোথাও পৌঁছোবার জন্য সদা ব্যস্ত তারাই আসলে মৃত্যুকে বেশি ভয় পায়।

আমি স্টেশন ও প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকালাম। দূরপাল্লার রেলযাত্রায় এই রকম ভোরবেলা ঘুম ভাঙলে প্রায় প্রতিবারই এক-একটা এই রকম আশ্চর্য সুন্দর ছোট্ট স্টেশন দেখতে পাই। নাম-না-জানা স্টেশন, চারপাশে শ্বাসরোধকারী দৃশ্য। প্ল্যাটফর্মটা আগাগোড়া সিমেন্টে বাঁধানো নয়, দু'ধারের দিকে পাথর আর মাঝখানে সুরকি ঢালা। স্টেশন মাস্টারের ঘরটিও পাথরের। কাছাকাছি আর বাড়িঘর নেই। অদূরেই পাহাড়। প্রায় স্টেশনের গা থেকেই সিঁড়ির মতন থাকে-থাকে পাহাড়ের সারি উঠে গেছে।

চায়ের জন্য এদিক-ওদিক তাকালাম। এক জায়গায় একটা উনুনের ওপর কেটলি চাপানো। সামনে একটা লোক র‍্যাপার দিয়ে কান ও মুখ ঢেকে বসে আছে। কাছে গিয়ে লোকটিকে বললাম, ভাই, চা হবে?

লোকটি কান ও মুখ থেকে র‍্যাপার সরিয়ে হিন্দীতে বলল যে, চা ফুরিয়ে গেছে। আবার বানানো হচ্ছে।

সুতরাং অপেক্ষা করতে হবে। এর মধ্যে ট্রেনটা না ছাড়লেই বাঁচি। গোটা প্ল্যাটফর্মে আর একটিও ফেরিওয়ালা নেই। তাতে বেশ স্বস্তিই বোধ করলাম। এই রকম একটা চোখজুড়োনো ভোরবেলায় বেশি লোকজনের চিৎকার যেন মানাত না।

হাঁটতে হাঁটতে প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষে এসে দাঁড়াবার পর চোখে পড়ল, পাহাড়ের উপর থেকে একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে আর একটি সাত-আট বছরের ছেলে হাত-ধরাধরি করে নেমে আসছে। মেয়েটির মাথায় একটা ঝুড়ি। মেয়েটি শুধু একটা শাড়ি পরেছে, ছেলেটির গায়ে একটা লম্বা ঢোলা জামা, তার নিচে প্যান্ট আছে কিনা বোঝা যায় না। বেশ শীত। আমার গায়ে সোয়েটারের ওপর কোট।

অপলকভাবে তাকিয়ে রইলাম সেই মেয়েটি ও ছেলেটির দিকে। একটা ঠাণ্ডা নিস্তব্ধতা। আকাশটা বাড়াবাড়ি রকমের নীল। সামনের প্রথম পাহাড়টিতে একটাও গাছ নেই, লালচে রঙের উজ্জ্বল পাথরের স্তূপ—সেই পাহাড় থেকে আসছে ঐ দুটি প্রাণী যাদের শীতবোধ নেই। সমস্ত দৃশ্যটাই যেন অলৌকিক মনে হয়।

আমি মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়লাম, ধোঁয়ার মতন বেরুলো। ছেলেবেলায় এই ব্যাপারটা কি ভালোই যে লাগত। নিজের মুখনিঃসৃত ধোঁয়ার দিকে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থাকতাম। এখনো একটুক্ষণের জন্য ছেলেমানুষ হয়ে গিয়ে বার বার মুখ দিয়ে ধোঁয়া বার করতে লাগলাম।

মেয়েটি ও ছেলেটি অনেক নিচে নেমে এসেছে। ওরা স্টেশনেই আসতে চায়। আমি ওদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে পেছন ফিরে দেখে নিচ্ছি ট্রেনের নড়াচড়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা।

ছেলেটি এখন মেয়েটির হাত ছেড়ে লাফাতে শুরু করেছে। বুঝতে পারলাম, শীত তাড়াবার জন্যই ঐ চাঞ্চল্য। মেয়েটি কিন্তু বেশ শান্ত। তার চলার মধ্যে একটা ছন্দ আছে।

মেয়েটি কাছে আসার পর জিজ্ঞেস করলাম, কি আছে তোমার ঝুড়িতে?

মেয়েটি উত্তর না দিয়ে মাথা থেকে ঝুড়িটা নামাল। দেখলাম কতকগুলো টাটকা কাঁচা পেয়ারা। মনে হলো যেন এক্ষুনি ছিঁড়ে এনেছে গাছ থেকে। এ-রকম টাটকা পেয়ারা অনেকদিন দেখিনি।

—কত করে?

—এক-একঠো দশ নয়া।

আমি দুটি বেশ পরিপুষ্ট পেয়ারা বেছে নিয়ে বললাম, এক জোড়া পনেরো নয়া হবে?

—নেহী বাবুজী!

—দেবে না? এক জোড়া তো নিচ্ছি—

—নেহী বাবুজী!

হঠাৎ ধাতস্থ হলাম। শহুরে লোক বলে দরাদরি করার অভ্যেসটা কিছুতেই

যায় না। কত সময় কত টাকাপয়সা আজেবাজে খরচ করি। আমার পরিচিত অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁরা এমন সিগারেট খান, যার এক-একটির দামই আট আনা বা তার বেশি। অনেক সময় তাঁরা আমার দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দেন। আমি অনাগ্রহের সঙ্গে একটা তুলে নিই। ধরাই, অন্যমনস্কভাবে আট আনা পুড়ে যায়। আর এই মেয়েটি পাহাড় পেরিয়ে কয়েকটি পেয়ারা বিক্রি করতে এসেছে সামান্য দশ পয়সা দামে, তা নিয়েও আমি দরাদরি করছি!

লজ্জিতভাবে পকেট থেকে পয়সা বার করতে গেলাম। খুচরো পয়সা নেই, এক টাকার নোট। মেয়েটির কাছে খুচরো নেই। সে অসম্ভব লাজুক। আমার টাকাটা দেখে মুখে কিছু না বলে ফিকফিক করে হাসতে লাগল। এর মধ্যে হাসির কি আছে?

একবার মনে হলো মেয়েটিকে পুরো টাকাটাই দিয়ে দিলে কেমন হয়? কিন্তু একবার পাঁচ পয়সার জন্য দরাদরি করে, পরক্ষণেই আবার একটা টাকা দিয়ে দেওয়ার মধ্যে একটা নাটকীয়তা আছে, যা আমার চরিত্রে ঠিক মানায় না। আমিও লজ্জা পাই।

বললাম, ঠিক আছে, আমি ঐখানে চা কিনতে গিয়ে টাকাটা ভাঙিয়ে নিচ্ছি, তুমি একটু পরে আমার কাছ থেকে দাম নিয়ে যেও।

মেয়েটি বিনা বাক্যব্যয়ে অন্য লোকজনের দিকে চলে গেল। আমি পেয়ারাতে কামড় বসালাম। গত সরস্বতী পুজোতে প্রসাদের মধ্যে বুঝি এক টুকরো পেয়ারা ছিল, তাছাড়া এর মধ্যে আর পেয়ারা খাইনি। এখন দুটোই খেয়ে ফেললাম। তেমন মিষ্টি নয়, একটু কষকষ, সেটাই আমার পছন্দ। মুখটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

চা তৈরি হয়ে গেছে। পর পর তিন ভাঁড় চা খেলাম। চায়ের সঙ্গে কাচা পেয়ারা দিয়ে ব্রেকফাস্ট এর আগে কখনো করিনি। তবু এরপর সিগারেট ধরাতেই মনের ভেতরটা আশ্চর্য হালকা হয়ে গেল। যেন এরকম আনন্দ জীবনে কখনো পাইনি। কি সুন্দর একটা অচেনা জায়গায় এই চমৎকার ভোরে আমি দাঁড়িয়ে আছি। যদি এরকম একটা উৎকণ্ঠাহীন স্থানে কয়েকটা দিন থেকে যাওয়া যেত।

তক্ষুনি মনে পড়ল। কতবার ট্রেনে যেতে যেতে আমি ভেবেছি এই রকম অখ্যাত ছিমছাম পাহাড়ী জায়গায় আমি বেড়াতে আসব। কখনো আসা হয়নি। আজ এখানে থেকে গেলে কেমন হয়? কি অসুবিধে আছে?

তক্ষুনি দৌড়ে গেলাম নিজের কামরার দিকে, সুটকেসটা নামিয়ে নেবার জন্য। সহযাত্রীরা অনেকেই ইতিমধ্যে জেগে উঠেছেন, আমি বাঙ্ক থেকে সুটকেসটা নামাতেই একজন বললেন, কি ব্যাপার, কোথায় চললেন?

গোটা একদিন ধরে এঁদের সঙ্গে এক কামরায় এসেছি, অনেক কথাবার্তা

হয়েছে, কে কোথায় যাব জানা হয়ে গেছে। এখন আমি যদি এই অসম্ভব জায়গায় নেমে পড়ার কথা বলি, এঁরা নিশ্চয়ই দারুণ আশ্চর্য হবেন। এই সব স্টেশনে কেউ নামে না। স্টেশনগুলো কেন তৈরি হয়েছে, তাই-ই বা কে জানে!

চক্ষুলজ্জার জন্য পৃথিবীতে কত কাজ পণ্ড হয়েছে। আমিও চক্ষুলজ্জা এড়াতে পারলাম না। শুধু এই জায়গাটা দেখতে ভালো লাগছে বলেই এখানে নেমে পড়ছি, এই কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারলাম না। বললাম, ভাবছি, পাশের একটা কামরায় অনেক জায়গা খালি আছে, সেখানে—

দুজন সহযাত্রী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, চলুন তো আমরাও গিয়ে দেখি, তাহলে না হয় একসঙ্গেই—

এই সময় আমাকে বাঁচাবার জন্যই হুইশল দিয়ে ট্রেনটা একটু নড়ে উঠল। ট্রেন ছাড়ছে। আর একটি সদিচ্ছার অঙ্কুরে বিনাশ হলো। আমি স্যুটকেসটা আবার বাঙ্কে তুলে রাখলাম। সেই মুহূর্তে মনে পড়ল মেয়েটিকে তার পেয়ারার দাম তো দেওয়া হয়নি? লাফিয়ে নেমে পড়লাম।

মেয়েটি বিস্মিতভাবে তাকিয়ে ছিল। আমি ছুটতে ছুটতে তার কাছে এসে পকেটের সব খুচরো পয়সা তুলে দিতে গেলাম তার হাতে। অতি ব্যস্ততায় পয়সাগুলো ছড়িয়ে গেলো মাটিতে। ট্রেন চলতে শুরু করেছে, আমার আর সময় নেই। আমি আবার দৌড়ে এসে উঠে পড়লাম নিজের কামরায়।

জানলা দিয়ে মেয়েটিকে দেখা যায় তখনো। সে নিচু হয়ে পয়সা কুড়োচ্ছে। কি করুণ সেই ভঙ্গি। আমার মনে হলো, আমি মেয়েটিকে অপমান করেছি। আমি অপরাধী।

শ্মশানের পাশে একজন

শ্মশানের পাশেই নিমগাছ। সেই গাছে উঠে একটা লোক খুব ব্যস্তভাবে মটমট করে ডালসুদ্ধ পাতাগুলো ভেঙে নিয়ে কোঁচড়ে ভরছে। সেদিকে এমনিই তাকিয়েছিলাম, কোনো কিছু চিন্তা করিনি, হঠাৎ পাশ থেকে একজন বলল, দেখেছ কাণ্ড!

চমকে উঠে বললাম, কি ব্যাপার?

—ঐ যে লোকটা নিমপাতা ছিঁড়চে? ঐগুলোই আমাদের খেতে হবে।

—কেন?

—ঐগুলোই তো বাজারে বিক্রি করবে!

আমি বুঝতে পারলাম, শীতের শেষ দিকে ভাতের সঙ্গে প্রথমেই নিমবেগুন খাওয়ার একটা রেওয়াজ আছে বটে। বাজারে এই সময় কচি কচি নিমপাতা ওঠে। এ বছর সেগুলোর দামও একটু বেড়েছে।

আমার সঙ্গী রাগতভাবে আবার বলল, বিনা মূলধনের ব্যাবসা, তা বলে শ্মশানের ধারের গাছটাকেও বাদ দেওয়া যায় না?

যে-লোকটি পাতাগুলো ভাঙছে, তার চেহারা খুবই দীনদরিদ্রের মতন। বেওয়ারিশ নিমগাছ সে আর কত খুজে পাবে, আজই নিশ্চয়ই শ্মশানের ধারের এই গাছটা নজরে পড়েছে। অন্য কেউ যাতে এসে না পড়ে, তাই ওর এত ব্যস্ততা। শুধু নিমপাতা কেন, টুথপেস্টের ওপর করবৃদ্ধির জন্য নিমডালের দাতনেরও নিশ্চয়ই চাহিদা বেড়েছে। অবিলম্বেই গাছটা নির্মূল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

আমাব পাশের লোকটির আপত্তি এই যে, শ্মশানের পাশে গাছ, যেখানে সব সময় মড়া-পোড়ানো হাওয়া লাগছে, সেই গাছের পাতা কি মানুষকে খাওয়ানো উচিত?

মানুষ-পোড়ানো হাওয়া লাগলে গাছের কোনো ক্ষতি হয় কিনা, কিংবা সেই গাছের পাতা খেলে জীবিত মানুষের কোনো ক্ষতি হয় কিনা, সে বিষয়ে কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য আমার জানা নেই। তবে আমার চোখ পড়ল অন্য এক দিকে। শ্মশানের পাশেই একটা ঝোপড়া, খুব সম্ভবত সেখানে চণ্ডালের স্ত্রীপুত্র-পরিবার থাকে। সম্প্রতি সেখানে মাটির উনুনে খিচুড়ি রাঁধা হচ্ছে, একটা বাচ্চা তার পাশেই বসে মড়ি চিবোচ্ছে। স্ত্রীলোকটি এবং বাচ্চাটির স্বাস্থ্য—টাচ উড—বেশ ভালোই। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, মড়াপোড়ানো হাওয়ায় এদের কোনো ক্ষতি হয়নি।

এ বিষয়ে আমি কিছু বলার আগেই আমার চেনা ব্যক্তিটি উত্তেজিতভাবে এগিয়ে গেল সেই গাছটির দিকে। ধমক দিয়ে বলল, এই, কি হচ্ছে কি? নামো ওখান থেকে?

লোকটি অবাক হয়ে হা করে তাকাল। সে বুঝতেই পারছে না, সে কি অন্যায় করেছে।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন লোক জমে গেছে সেখানে। শ্মশানে শুধু শোকগ্রস্ত লোকেরাই আসে না। সব জায়গার মতন শ্মশানেও মানবজাতির বিচিত্র সব রকম উপাদানই সমবেত হয়, একদল হৈ-হৈ-করা শ্মশানযাত্রীকে সব শ্মশানেই দেখা যায়, যাদের প্রাণের স্ফূর্তি কখনোই কমে না। আসলে জীবিত লোকেরা মৃত্যুকে গ্রাহ্য করে না তেমন। শ্মশানেই ব্যাবসার আলোচনা কিংবা আদি রসাত্মক রসিকতা আমি নিজের কানে শুনেছি। কোনো যুবতী নারী যখন শ্মশানে এসে শোক করে, তখন অন্যরা তার দিকে যে দৃষ্টিতে যে দিকে তাকায়, সেটা ঠিক মমতা নয়।

এইরকম কয়েকজন লোক এসে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে? কি হয়েছে?

আমার পরিচিত লোকটি বলল, দেখুন না এখান থেকে নিমপাতা পাড়ছে —এগুলোই বাজারে বিক্রি করে লোককে খাওয়াবে।

সকলেরই ধারণা হয়ে গেল, এটা একটা মহা অন্যায় ব্যাপার। চোখের সামনে এরকম ঘটনা অনুষ্ঠিত হতে দেখলে সকলেরই প্রতিবাদ করা উচিত।

—এই, নেমে এসো, শিগগির নেমে এসো।

—আজকাল সব কিছুতেই ভেজাল মাইরি!

—শ্মশানেও লোকে চুরি করতে আসে!

গাছের উপরের লোকটি ভ্যাবাচাকা খেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। নিচের লোকেরা আরো তর্জন গর্জন করতে লাগল।

শ্মশানটা খুব সম্ভবত মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা। সেখান থেকে যদি কেউ কোনো জিনিস নেয়, তা হলে কর্তৃপক্ষ আপত্তি জানাতে পারে, অন্য কারুর তো কিছু বলার নেই। কিন্তু যেহেতু লোকটির পরনে একটা নেংটি এবং গায়ে জামা নেই, তাই তাকে বাবু-শ্রেণীর লোকেরা সব সময়ই ধমকাতে পারে। পার্কের ফুলগাছ থেকে যদি আমি ফুল ছিঁড়ি, তা হলে সেখানে জনসাধারণ আপত্তি করে না। তা ছাড়া এখানে আবার জনস্বাস্থ্যের ব্যাপার জড়িত কিনা।

আমি আমার পরিচিত ব্যক্তিটিকে ফিসফিস করে বললাম, দেখো, বাজারে যে-সব কিনতে পাওয়া যায়, সেগুলো যে কোনটা কোথা থেকে আসছে তা কি আমরা বুঝতে পারি?

সে কিছু উত্তর দেবার আগেই পাশ থেকে আর একজন শুনতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠে বলল, সে মশাই যেটা দেখতে পাচ্ছি না, সেটা আলাদা কথা। তা বলে চোখের সামনে দেখেও...!

আমি চুপসে গেলাম একটু। অচেনা লোকজনের সঙ্গে তর্ক করা আমার স্বভাব নয়। তাছাড়া, হয়তো এই লোকগুলিই ঠিক বলছে, আমিই ভুল করছি। এতগুলি লোক কি একসঙ্গে ভুল করে?

ধমকের চোটে নিমগাছের ওপর থেকে লোকটিকে নামানো হলো। কাঁদো কাঁদো মুখ।

—এখানে কি হচ্ছে কি অ্যাঁ?

—বাবু, দুটো নিমপাতা পাড়ছি।

—নিমপাতা পাড়ছ? আর জায়গা পাওনি? কি হবে এগুলো দিয়ে?

—বাবু, বিক্রি করব। দুটো পয়সা পাব।

সকলে আবার হৈ-হৈ করে উঠল। তা হলে ঠিকই ধরা গেছে। এই লোকটা

শ্মশানের নিমপাতা মানুষকে খাওয়াবার তালে ছিল। কত বড়ো পাষণ্ড!

আমি সেখান থেকে সরে পড়লাম। এত লোক যখন বলছে তখন নিশ্চয়ই শ্মশানের গাছের কোনো জিনিস খাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়। কিন্তু যে লোক নিমপাতা বিক্রি করে সংসার চালায়, তার কি স্বাস্থ্যজ্ঞান থাকার কথা?

জনতা মারমুখী হয়ে উঠেছিল প্রায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর মারধোর পর্যন্ত গড়াল না। লোকটির কাছ থেকে সমস্ত নিমপাতাগুলো কেড়ে নিয়ে ফেলে দেওয়া হলো নদীতে। লোকটিকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হলো।

কিছুক্ষণ বাদে আমি যখন ফিরছি, তখন দেখি সে বাইরে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যেন তার কোথাও যাবার নেই, পৃথিবীতে তার কিছুই করার নেই।

লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে আমি দারুণ চমকে উঠলাম। মনে হলো, এতক্ষণ শ্মশানে আমি এর চেয়ে বেশি দুঃখিত মানুষ আর একজনও দেখিনি।

ভোরবেলা, পার্কে

পার্কের বেঞ্চিতে বসে আছেন তিন বুড়ো। সামনে পুকুরের জল মিহি বাতাসে কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে, দেবদারু গাছগুলিতে নতুন ফিকে-সবুজ পাতা এসেছে। শীত চলে গেল বলে এখন সকালের দিকে পার্কে বেশ ভিড় হয়। কুকুর ও বাচ্চা ছেলে সমেত আসে গণ্যমান্য লোকেরা, স্বাস্থ্য-সচেতন যুবকরা আসে সাঁতার কাটতে, অন্য যুবকরা যুবতীদের সঙ্গে নিরিবিলি কোণ খোঁজে, সারাদিন যাদের মোটরগাড়ি কিংবা এয়ার-কণ্ডিশানড ঘরে কাটে—এমন ধনীরা এখন কেডস জুতো পরে আধ ঘণ্টা শখ করে হাঁটাহাঁটির জন্য আসে, সকালের কলেজ-পালানো ছেলে ও মেয়ের দঙ্গলও আলাদা আলাদা ভাবে আসে।

সকালের দিকে পার্কের বেঞ্চগুলিতে জায়গা পাওয়া শক্ত। তবু এই তিন বৃদ্ধ খুব ভোর-ভোর এসে নির্দিষ্ট একটা বেঞ্চে আগেভাগে জায়গা দখল করে রাখেন।

পার্কের বেঞ্চগুলি চাকরি থেকে রিটায়ার্ড বৃদ্ধদের একটা আড্ডাস্থল। প্রাক্তন কর্মজীবনের মান অনুযায়ী তাঁদের নাম। ভূতপূর্ব অফিসাররা এখনো দাস সাহেব, বোস সাহেব, মুখার্জি সাহেব। আর অন্যরা সেনবাবু, দাশগুপ্তবাবু, রায়বাবু। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে এই তিন বৃদ্ধের কিছুটা যেন তফাত আছে। এদের তিনজনেরই পরনে ঢেঙো ধুতি, আধময়লা পাঞ্জাবি আর রবারের চটি, গালে দু-তিন দিনের পাকা দাড়ি।

বৃদ্ধেরা সাধারণত বেশি বকবক করেন অথবা খুবই কম কথা বলেন। এঁদের তিনজনকে দেখলে মনে হয় যেন জীবনের সব কথাবার্তা ফুরিয়ে গেছে। একজন হয়তো বললেন, এবার শীতটা যাই-যাই করেও যাচ্ছে না!

অন্য দুজন চুপ। ভদ্রতা করেও কোনো উত্তর দেবার যেন দরকার নেই। প্রথম বৃদ্ধ উত্তর আশাও করেননি মনে হয়। কথাটা বলার পর তিনি গলায় হাত বুলোলেন। রোগা-রোগা লম্বা হাতেব আঙুল।

দু'মিনিট বাদে আর একজন বললেন, হুঁ! ঠিকই ভেবেছিলাম।

তৃতীয় বৃদ্ধ দ্বিতীয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করেই সব বুঝে ফেলেন। তবু অনেকটা সময় নিয়ে তিনি বলেন, বিয়ে-টিয়েগুলো এখনো দেশ থেকে উঠে গেল না?

এসব কথাব তাৎপর্য বাইবের কারুব পক্ষে বোঝা অসম্ভব। এর পর একজন পকেট থেকে একটা টিনের কৌটো বার করে তার থেকে একটা বিড়ি নিয়ে ধরালেন। অন্যদের দিলেন না। তবু দ্বিতীয় বৃদ্ধ হাত বাড়িয়ে বললেন, দেখি একটা! তখন প্রথম বৃদ্ধ তৃতীয় জনের দিকেও কৌটোটা বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু তৃতীয় জন বললেন, থাক।

পুকুরেব ধাব ঘেঁষে তিন জোড়া যুবক-যুবতী বসে আছে, হয়তো তাদেব উদ্দেশেই পুকুরে সাঁতার-রত ছেলেরা দারুণ ঝাপাঝাঁপি শুরু করেছে, মাড়োয়ারি প্রৌঢ় অবাধ্য কুকুরকে ধমকাচ্ছেন ইংরেজিতে, চমৎকার বাতাসেব মধ্য দিয়ে উড়ে গেল এক ঝাঁক শালিক। আব, সব কিছুর মাঝখানে বসে আছে তিনজন বেখাপ্পা চেহারার বৃদ্ধ। তিনজনই রোগা ও লম্বা, আশির কাছাকাছি বয়েস, আর সব কিছুই সাধারণ, শুধু মুখে একটা সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের হাসি।

দুটি মাস্তান চেহারার যুবক হন্তদন্ত হয়ে বেঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, দেখি দাদু, একটু মেরে বসুন তো!

তিন বৃদ্ধ অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সরে গিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসলেন। দুই যুবক বাকি স্থানটুকু দখল করে ফস করে সিগারেট জ্বালালে। তারপর একজন বলল, মাইরি, ফন্টেশালাকে কাল এত করে বললাম—

অন্যজন বলল, দেব শালাকে একদিন হাতে হ্যারিকেন করে—

এই যুবকটির কথাবার্তাও বৃদ্ধদের কাছে দুর্বোধ্য লাগে। কিন্তু বোঝা যায়, ওরা কান খাড়া করে আছেন। তিনজনেই ইদানীং কানে কম শুনছেন, তাই বেশি মনঃসংযোগ করতে হয়।

একটা জিনিস খুব সহজেই বোঝা যায়, এই যুবক ও বৃদ্ধের দল প্রথম দর্শনেই পরস্পরকে অপছন্দ করেছে। অচেনা বৃদ্ধদের সাধারণত সব যুবকই অবজ্ঞা করে থাকে। তারা মনে করে, এরা সব ঝড়তি পড়তি, কোনো কিছু করার মুরোদ নেই,

শুধু ক্যাটক্যাট করতে জানে। টাকাই বার্ধক্যের শক্তি। যে বৃদ্ধের টাকা নেই, সে ফালতু। অন্য দিকে, বৃদ্ধেরা ঈর্ষা করে যুবকদের। যে পৃথিবীটা একদিন তাঁদের ছিল, আজ সেটা নিয়ে নিয়েছে এই সব ছেলেছোকরারা। এই সব ছোকরাদের বিদ্যে না থাক, গুণ না থাক, টাকা না থাক, শুধু যৌবনের শক্তিতেই এরা ডগমগ করে।

একজন যুবক বলল, ও দাদু, একটু সরে বসতে বললাম না! আমাদের একেবারে ঠেলে ফেলে দিচ্ছেন যে!

তিন বৃদ্ধ পরস্পরের চোখের দিকে তাকালেন। এখন মাত্র সাড়ে সাতটা বাজে, নটা বাজার আগে কেউ বাড়ি ফেরেন না। বাড়ি ফেরা সম্পর্কে আগ্রহও নেই কারুর, গৃহ এঁদের কাছে শান্তির নীড় নয়। সকালে রোদের ঝাঁঝ অসহ্য না-হওয়া পর্যন্ত পার্কেই এঁদের সবচেয়ে ভালো সময় কাটে।

দুই বৃদ্ধ আর একটু সরে বসলেন বটে, কিন্তু একজন উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে যুবক দুটি বলল, আরে দাদু, উঠলেন কেন, রাগ হয়ে গেল নাকি? বসুন, বসুন!

তৃতীয় বৃদ্ধ কোনো উত্তর না দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। এক যুবক আর এক যুবককে বলল, বুড়ো দাদু খেপচুরিয়াস হয়েছে মাইরি!

যৌবন বড়ো কৌতুকপ্রবণ। যুবক দুটি বেশ মজা পেয়ে গেল। একজন তড়াক করে উঠে গিয়ে বৃদ্ধের হাত ধরে টানাটানি করতে করতে ইয়ার্কির সুরে বার বার বলতে লাগল, আরে দাদু, আসুন, আসুন না—

বৃদ্ধ দু-একবার হাত ছাড়িয়ে নেবার জন্য টানাটানি করতেই ব্যাপারটা আরো হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। এদিকে ওদিকে বসে থাকা যুবক-যুবতীরাও মৃদু মৃদু হাসে। রাগী বুড়োদের দেখতে সকলেরই ভালো লাগে।

অপর দুজন বৃদ্ধ উঠে এসে সঙ্গীর পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, কি হচ্ছে কি, ছেড়ে দাও!

আস্তে আস্তে চার পাশে ভিড় জমে। ছোট ছেলেরা হাততালি দেয়। তখন একজন বৃদ্ধ হাত জোড় করে শান্তভাবে বলেন, বাবা, আমাদের তোমরা ছেড়ে দাও, আমরা চলে যাচ্ছি।

অতি কষ্টে যুবকদের হাত ছাড়িয়ে বৃদ্ধ তিনটি চলতে শুরু করেন। পিছন থেকে নানা রকম মন্তব্য আসে। কৌতুকের দৃশ্যটি এত সহজে শেষ হয়ে যাবার জন্য মনঃক্ষুণ্ন হয় কেউ কেউ।

বৃদ্ধ তিনটি চুপচাপ হাঁটতে থাকেন। তাঁদের মুখে ঠিক রাগের চিহ্ন নেই, বরং খানিকটা চাপা বাঙ্গের হাসি। এই পার্কে আর আসা হবে না, তারা বুঝে গেছেন।

এই বৃদ্ধ তিনজনের নাম শুনলে কেউ চিনতে পারবে না। নিজেদের বাড়িতেও এঁদের কোনো খাতির নেই। এঁদের মধ্যে একজন সরকারের কাছ থেকে পেনশান পান দেড় শো টাকা। যৌবনে সাতটি বছর জেলে কাটিয়েছেন, তখন দেশোদ্ধারের ভূত চেপেছিল মাথায়। আর একজন তাম্রপত্র পেয়েছেন দিল্লি থেকে— শোভাবাজার বোমার ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিলেন এবং যৌবনে তিনি এই যুবকদের চেয়ে ঢের বেশি ডানপিটে ছিলেন। আর একজন ছিলেন অশ্বিনী দত্তের চেলা— বরিশালে যেবার পুলিশ লাঠি চালায়— বাংলাদেশের জেল থেকে ঠিক মতন রেকর্ড পাওয়া যায়নি বলে ইনি এখানকার সরকারের কাছ থেকেও কোনো স্বীকৃতি পাননি। এ দেশে এখন আর এঁদের জন্য কিছুই নেই, একটা পার্কের বেঞ্চে সকালবেলার সুখভোগ ছিল, আজ থেকে তাও গেল।

জ্যান্ত উনবিংশ শতাব্দী

আমার বাবা একবার কাশীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে একজন লোক, খুবই কম চেনা, বাবার হাতে একটা কাগজের মোড়ক দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন সেটা কলকাতার কোনো একটা ঠিকানায় পৌঁছে দিতে। শুধু অনুরোধ নয়, কাকুতি মিনতি করেছিলেন লোকটি, তাই বাবা উপরোধটি ঠেলতে পারেননি, নিয়ে এসেছিলেন সেটা। বেশ যত্ন করে বাঁধাছাঁদা কাগজের মোড়ক, এক ফুট লম্বা, অনায়াসেই রেজেস্ট্রি ডাকে পাঠানো যেত, কিন্তু লোকটি বোধহয় ডাকখরচ বাঁচাতে চেয়েছিল।

কলকাতায় ফিরে বাবা সেই মোড়কটি যথাস্থানে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দিলেন আমাকে। এই সব বেগারের কাজ মোটেই কারুর ভালো লাগে না। কিন্তু আমি বাড়ির বাইরে বেশ সাহসী পুরুষ হলেও নিজের বাড়িতে বেশ ভীরু, কোনোদিন বাবার হুকুম অগ্রাহ্য করতে পারিনি।

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বেরুলাম। ওপরে নাম-ঠিকানা লেখাই আছে, যেতে হবে সেই বেহালায়। সবে মাত্র মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়েছি, দুই বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তারা বলল, কি রে কোথায় যাচ্ছিস? হাতে ওটা কি?

আমি নির্বিকার মুখে বললাম, এটা এক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

—ভেতরে কি আছে?

—কি জানি!

এক বন্ধু আমার হাত থেকে সেটা নিয়ে বলল, ভেতরে কি আছে খুলেও

দেখিসনি। যদি বেআইনি কিছু থাকে, গাঁজা-ফাঁজা এই রকমভাবে চালান দেয়!

অন্য বন্ধুটি সেটা নিয়ে ওজনটা অনুভব করার জন্য লোফালুফি করল কয়েকবার। তারপর বলল, নাঃ, শুধু কাগজপত্রই আছে মনে হয়।

—এখন এটা পৌঁছে দিতে সেই ধাদ্ধাড়া গোবিন্দপুরে যাবি!

—কি করব, উপায় কি?

—এটা খুলে দ্যাখ ভেতরে কি মাল আছে। যদি শুধু আজেবাজে কাগজ থাকে, তাহলে ফেলে দে রাস্তায়। বাবাকে গুল মেরে দিবি, ঠিক পৌঁছে দিয়ে এসেছি। বাসভাড়ার পয়সাটা বেঁচে যাবে, সেই পয়সা দিয়ে আমাদের চা খাওয়া।

কে না জানে, বন্ধুবাই সব সময় কু-মন্ত্রণা দিয়ে বাড়ির ছেলেদের খারাপ করে দেয়। আমার অন্য কোনো বন্ধুর হাতে এই রকম প্যাকেট দেখলে আমিও বোধহয় ঠিক এইরকম কথাই বলতাম।

তবে, কারুর কথা চট করে মেনে নেওয়া উচিত নয়। আবার বন্ধুদের সামনে পিতৃভক্ত সাজাও ঠিক ফ্যাসান নয়। তাই কোনো মন্তব্য না করে হাসতে লাগলাম।

তখন এক বন্ধু বলল, ঠিক আছে, তুই না খাওয়াস তো আমিই খাওয়াচ্ছি, আয়।

অপরের পয়সায় চা খাওয়ার প্রস্তাব পেলে প্রত্যাখ্যান করার নিয়ম পৃথিবীতে কোথাও নেই। সুতরাং যেতে হলো। খানিকটা পরে চা-টা খেয়ে বেরিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে মারতে কিছুদূরে চলে আসার পর খেয়াল হলো, সেই প্যাকেটটা আমি চায়ের দোকানে ফেলে এসেছি। একবার ভাবলুম, যাক—গেছে যখন যাক। আবার মনটা একটু খচখচ করতে লাগল। যদি বিশেষ কিছু দরকারি দলিলপত্র হয়। ফিরে গিয়ে নিয়ে এলাম। এবং এক সময় চেপে বসলাম বেহালার বাসে।

ঠিকানা খুঁজে পেতে রীতিমতন কষ্ট হলো। অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়ে মাঠের মধ্যে একটা বাড়ি। উঠোনে তুলসীমঞ্চ, কয়েকটা সিঁড়ির পাশে দালান, তারপর দুটি ঘর। ছোট বাড়ি, বাইরে প্লাস্টার করা নেই।

মোড়কটির ওপর যে নাম লেখা ছিল, সেই নাম ধরে ডাকাডাকি করতেই একজন রোগা মতন প্রৌঢ় লোক বেরিয়ে এলেন। ধুতি পরা, খালি গা, গলায় খুব মোটা পৈতে।

আমার ইচ্ছে ছিল প্যাকেটটা দিয়েই চলে আসা—সংক্ষেপে ঘটনাটা জানিয়ে সেটা বাড়িয়ে দিয়েছি প্রৌঢ়টির দিকে, তিনি সেটা গ্রহণ না করে জিজ্ঞাসা করলেন, কি নাম?

আমি শুধু নামটা বললাম।

উনি একটু ধমকে বললেন, পদবী কি?

আমার পদবীটা শুনে উনি একটু প্রসন্ন হলেন মনে হলো। অর্থাৎ উনি জেনে নিতে চাইলেন আমি ব্রাহ্মণ কিনা। আমার একটু হাসি পেল।

প্রৌঢ় বললেন, জুতো খুলে ওপরে উঠে এসো।

কথাটার মধ্যে খানিকটা হুকুমের সুর ছিল। তাই অগ্রাহ্য করা গেল না, জুতো খুলে সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালাম। উনি ডাকলেন, উমা, উমা!

একটি সতরো-আঠারো বছরের মেয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। প্রৌঢ় তাকে বললেন, ভদ্দরলোকের পা ধোওয়ার জল এনে দে।

বারান্দার কোণে একটি জলভর্তি বালতি রাখা ছিল। মেয়েটি তার থেকে একমগ জল নিয়ে এগিয়ে এল আমার দিকে।

এক ধরনের লোক আছে, যারা পৃথিবীর সমস্ত নারীকেই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক মনে করে। তাদের দিয়ে যেন যা ইচ্ছে করানো যায়। এই লোকটি সেই জাতের। নিজের বাড়ির মেয়েকে দিয়ে একজন অচেনা লোকের পা ধুয়ে দিতে বলার মধ্যে একটা বর্বরতা আছে। এটা সৌজন্য নয়, কারণ, ব্রাহ্মণ না হলে উনি আমাকে উপরেই উঠতে দিতেন না। আমাদের ধারণা বুঝি গ্রামে-ট্রামেই এত সব শুচিবায়ুগ্রস্তরা থাকে। কিন্তু কলকাতাতেও এরকম স্যাম্পেল এখনো রয়ে গেছে দেখছি।

প্রৌঢ়টি আমাকে যে ঘরে বসালেন, সে ঘরটি অসম্ভব নোংরা। দারিদ্র্য নয়, স্বাস্থ্যজ্ঞানহীনতা। ঘরের মেঝেতে মুড়ি ছড়ানো, দেয়ালে পানের পিক ও গুড়ের দাগ, বহুকাল ছাদের ঝুল ঝাড়া হয়নি, খাটের তলায় ভয়াবহ রকমের ধুলো। কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি রয়েছে, সেই জন্যই বুঝি জুতো খুলে আসা ও পা ধোওয়া, কিন্তু ঠাকুরকে এরকম নোংরা ঘরে বসাতে কোনো লজ্জা নেই।

প্রৌঢ়টি তার মেয়েকে বললেন, মিষ্টি নিয়ে আয়।

আমি ঘোরতর আপত্তি করতে লাগলাম, কিন্তু মেয়েটি অবিলম্বে একটা পিতলের রেকাবিতে কয়েকটা চিড়ের মোয়া ও নারকেলের নাড়ু নিয়ে এল। হোম-মেড জিনিস! এসব ফোক কালচারের প্রতি অনেকের বেশ আকর্ষণ থাকে, কিন্তু আমি ভালোবাসি চপ, কাটলেট, ডিম ভাজা। বললাম, এক গেলাস জল।

মেয়েটি মিষ্টির সঙ্গে জল দেয়নি, এমনকি আমি চাইবার পরও দ্বিধা করতে লাগল। কুণ্ঠিতভাবে তাকাল আমার দিকে। ব্যাপারটা বুঝলাম একটু পরেই। এ বাড়িতে এই মেয়েটিই একমাত্র আকর্ষণীয় বস্তু, কিন্তু ঠিক কতবার যে এর দিকে তাকানো চলে, তা তো জানি না।

মেয়েটি এক গ্লাস জল এনে রাখল। রীতিমতন ঘোলা জল। আমি সেদিকে

সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়েছি, প্রৌঢ়টি বললেন, জলে ময়লা নেই। আমরা কলের জল খাই না, কুয়োর জলের সঙ্গে গঙ্গা জল মেশানো আছে।

বুঝলাম, পাগলের বাড়িতে এসে পড়েছি। অন্তত পাগল হোক বা না হোক এরা আমার টাইপ নয়। আমি সেই মিষ্টি ও জল স্পর্শ করলাম না। মেয়েটির জন্য মায়া হলো।

তক্ষুনি উঠে পড়ছিলাম, কিন্তু প্যাকেটের মধ্যে কি আছে সেটা দেখার কৌতূহল দমন করতে পারিনি। প্রৌঢ়টি তখন সেটা খুলছিলেন। ভেতর থেকে বেরুলো কতকগুলো গোল গোল কাগজ, পুরোনো ধরনের হাতের লেখায় ভর্তি। বুঝতে অসুবিধে হলো না, কয়েকটি ঠিকুজী-কোষ্ঠী।

আমার মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। এরই জন্য আমাকে বন্ধুবান্ধবদের আড্ডা ছেড়ে, এতখানি রাস্তা বাসে ঝুলতে ঝুলতে আসতে হলো! লোকগুলো মহা স্বার্থপর তো!

প্রৌঢ়টি বলল, বাঃ সবই ঠিকঠাক আছে। বড়ো উপকার করলে ভায়া। তোমার পিতাকে আমার নমস্কার জানিও। বুঝলে না, এসব জিনিস ডাকে পাঠানো যায় না। পোস্টাফিসে বারো জাতের লোক চাকরি করে, তারা ঘাঁটাঘাঁটি করলে এসব পবিত্র জিনিসের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। তাই বলেছিলাম, কোনো সৎ ব্রাহ্মণের হাত দিয়ে পাঠাতে। মানুষের জন্য মানুষ এটুকু করেই।

আমি বললাম, কাশীতে তো আমার বাবাকে বলা হয়েছিল, ভীষণ তাড়াতাড়ি পাঠানো দরকার—ডাকে যদি দেরি হয়ে যায়, তাই লোক মারফত...

—ওরকম একটু বলতে হয়। সবাই কি আর সব কথা বোঝে?

এবার আমার পক্ষে রাগ সামলানো শক্ত হলো। এই লোকটি যদি এর উদ্ভট চিন্তাধারা প্রকাশ করতে পারে, তা হলে আমিই বা বলব না কেন। আমি বললাম, শুনুন—আমাদের বংশে আবার সত্যিকথা বলার একটা ধারা আছে। তাই কয়েকটা কথা আপনাকে জানানো দরকার। আমার পৈতে নেই, গায়ত্রী মন্ত্র জানি না! পার্ক সার্কাসের গরুর মাংসের কাবাব এবং লিণ্ডসে স্ট্রিটের শুয়োর মাংসের সসেজ আমার অতি প্রিয় খাদ্য। আমি ছাড়াও এই প্যাকেটটা আর যারা ছুঁয়েছে তাদের মধ্যে আছে...।

লোকটা স্প্রিংয়ের মতন উঠে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, আজ চলি—।

বাঙালির গান

অনুপমের সঙ্গে ওদের বাড়ির বসবার ঘরে বসে গল্প করছিলাম, এমন সময় ওর ছোট বোন রিনি সাঙ্ঘাতিক ব্যস্ত হয়ে সেখানে ঢুকে পড়ল। আমাকে দেখে একটু থতমত খেয়ে গেল, কিছু একটা জরুরি কথা বলতে এসেছিল অনুপমকে, মুখের ভাব দেখে সেইরকম মনে হয়।

রিনির বয়েস চোদ্দ-পনেরো হবে, এবার স্কুল ফাইনাল দেবে। শাড়ি পরতে শুরু করেছে, ফ্রকও ছাড়েনি। বেশ লম্বা চুলের গোছা হয়েছে রিনির।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি খবর? কেমন আছ!

এই বয়েসের মেয়েরা একটু বেশি লাজুক হয়। মাথা হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন তো?

তারপর সে অনুপমের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

অনুপম বলল, কি রে? কিছু বলবি?

—রেডিওটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, আর চলছে না।

—কেন, চলছে না কেন?

—ক'দিন ধরেই তো মিনমিন করছিল। ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে।

অনুপম কপাল কুঁচকে কিছু একটা হিসেব করল। তারপর বলল, হ্যাঁ, ব্যাটারি তো শেষ হয়ে যাবারই কথা। অনেকদিন চলল। আবার কিনে আনতে হবে।

—এখন কিনবে না?

—এখন? এই রোদ্দুরের মধ্যে কে যাবে।

—কাছেই তো দোকান। তুমি টাকা দাও, আমি কিনে আনছি।

—এত ব্যস্ততা কিসের রে! যা, যা, এখন হবে না।

—বাঃ, আমি বুঝি রেডিও শুনব না।

সকাল এগারোটা-সাড়ে এগারোটা বাজে। এই সময় রেডিওতে কি এমন সাঙ্ঘাতিক অনুষ্ঠান থাকে, আমার তা জানবার কথা নয়। একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম রিনির দিকে।

রিনি তক্ষুনি ব্যাটারি কেনার জন্য বায়না ধরেছে, অনুপম কিছুতেই রাজি নয়।

এই সব ক্ষেত্রে আমি সব সময়েই বাচ্চা মেয়েদের সমর্থন করি। অনুপমকে বললাম, কাছেই যখন দোকান, নিয়ে আয় না ব্যাটারি! বেচারা এত করে বলেছে।

অনুপম বলল, তুই জানিস না! সব সময় ও কানের কাছে একটা রেডিও

খুলে রাখবে। পড়াশুনোর সময় পর্যন্ত!

আমি বললাম, রিনি তো রেজাল্ট ভালোই করে।

—আরো ভালো করতে পারত, যদি না রেডিওর জন্য এ রকম পাগল না হতো—

যাই হোক, অনুপম শেষ পর্যন্ত রাজি হলো। ওদের চাকর দু' মিনিটের মধ্যে ব্যাটারি কিনে আনল মোড়ের দোকান থেকে। ট্রানজিস্টারে সেই ব্যাটারি ভরতেই ঝনঝন আওয়াজ বেরল। রিনি রেডিওটা ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেল ওর পড়ার ঘরের দিকে। মহম্মদ রফি না কিশোরকুমার—কার যেন জোরালো গলার গানে গমগম করতে লাগল সারা বাড়ি।

অনুপম বলল, দেখলি তো, হিন্দী-মিন্দি গানের জন্য কি রকম টান এখনকার ছেলেমেয়েদের।

আমি কথা না বলে একটু হাসলাম। আমার মনে পড়ল আর একদিনের ঘটনা। সেদিন সন্ধের পর বসেছিলাম সুবিমলদার বাড়িতে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের দু'একদিন মাত্র বাকি। আমরা খুব উত্তেজিত, সর্বক্ষণ ঐ এক আলোচনা। সুবিমলদা বসবার ঘরের বিরাট রেডিওটা চালিয়ে রেখেছেন, যদি কোনো নতুন খবর জানা যায়। একটু বাদেই দিল্লি থেকে ইংরেজি খবর শোনাবে।

সবেমাত্র ইংরেজি খবরের ঘোষণাটা হয়েছে, এই সময় সুবিমলদার এগারো বছরের মেয়ে ঝুমপা ঘরে ঢুকেই বলল, ওমা, সাড়ে ন'টা বেজে গেছে?

বলার সঙ্গে সঙ্গে ঝুমপা ঘুরিয়ে দিল রেডিওর কাঁটা অন্যদিকে, বেজে উঠল হিন্দী গান। সুবিমলদা এত অসম্ভব বেগে গেলেন যে নিজেকে সামলাতে পারলেন না। চট করে উঠেই তিনি ঝুমপাকে এক চড় মেরে বললেন, তুই কাঁটা ঘোরালি কেন? অসভ্য মেয়ে! ফের যদি কোনোদিন হিন্দী গান শুনতে দেখি—

ঝুমপা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল প্রথমটায়। সুবিমলদার মেয়ে খুব আদরের, তাকে চড় মারা তো দূরের কথা, তার কোনো কাজে বাড়িতে কেউ কখনো বাধা দেয় না। আজ দেশাত্মবোধের উত্তেজনায় সুবিমলদা কঠোর হয়ে উঠেছেন।

ঝুমপা বলল, বাঃ, আমি গান শুনব না?

সুবিমলদা বললেন, দেখছিস না আমি খবর শুনছি! এই সময় গান না শুনলে চলে না! জিজ্ঞেস করা নেই, কিছু নেই।

ঝুমপা হঠাৎ কেঁদে ফেলে দুপদাপ করে ঘর থেকে চলে গেল। খানিকটা বাদে আমি বাথরুমে যাবার জন্য উঠলাম। বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। সেখান থেকে ভেসে আসছে হিন্দী গানের ক্ষীণ আওয়াজ। ছোট একটা ট্রানজিস্টার

যোগাড় করে ঝুমপা বাথরুমে বসেই গান শুনছে।

সেদিন ঝুমপার প্রতি আমার সহানুভূতিই হয়েছিল। ঐটুকু মেয়ের পক্ষে যুদ্ধ-টুদ্ধের খবর নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা নয়। সাড়ে ন'টার সময় কিছু একটা নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম সে নিয়মিত শোনে—সেটার জন্যই সে টান অনুভব করেছিল। তাকে বকুনি দেওয়ার তো কোনো মানে হয় না।

যে-কোনো বাড়িতে গেলেই আজকাল দেখা যাবে—নয় থেকে উনিশ বছরের মেয়েরা রেডিও খুব ভালোবাসে। তাদের পড়ার টেবিলে, খাবার টেবিলে কিংবা কোলের ওপর একটা ট্রানজিস্টার থাকবেই। এবং তারা রেডিওর অন্যান্য প্রোগ্রাম নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। তারা শোনে বিবিধ ভারতীর হিন্দী গান। কোন্ সময় কি অনুষ্ঠান হয়, তাদের মুখস্থ। তারা গান ভালোবাসে, তাই তারা শোনে, এর মধ্যে অস্বাভাবিক তো কিছু নেই। ওদের কোনোক্রমেই দোষ দেওয়া উচিত নয়। ছেলেরা সাধারণত এতটা রেডিওর গানের ভক্ত নয়। আর উনিশ বছরেরও বেশি বয়েসের মেয়েরা যদি সব সময় বিবিধ ভারতী নিয়ে মত্ত থাকে—তবে অবশ্য তাদের নিছকই হালকা চরিত্রের বা অপরিণত বলতে হবে।

মানুষের মনের মধ্যে নানারকম তৃষ্ণা থাকে। গান শোনাও সেই রকম একটা তৃষ্ণার ব্যাপার। কোনো তৃষ্ণাই দমন করা যায় না। গুরুজনের সামনে দুঘণ্টা বসে থেকে যে যুবক সিগারেট খেতে পারে না, সে গুরুজনদের চোখের আড়াল হলেই পর-পর দু'তিনটে সিগারেট খেয়ে তৃষ্ণা মিটিয়ে নেবে। তেমনি, গানের যার তৃষ্ণা, তাকে বকুনি দিলে সে তো বাথরুমে বসেও গান শুনবেই।

অল্পবয়েসী বাঙালি ছেলেমেয়েরা আজকাল ভালোবাসে হিন্দী গান। অন্য ভাষায় আধুনিক গানের প্রতি এ রকম আসক্তি খুবই অদ্ভুত হলেও এখানে আর কোনো উপায় তো নেই। অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েদের মুগ্ধ করার মতন বাংলা গান তো নেই। আমি দেখেছি, আধুনিক বাংলা গানের চেয়ে হিন্দী সিনেমার গান অনেক বেশি জোরালো। রচনা, সুর এবং গায়ক-গায়িকাদের কণ্ঠ—সবই বেশি ভালো। আমাদের বাংলায় গর্ব করার মতন আছে রবীন্দ্রসঙ্গীত, কিন্তু তার মধ্যেও একঘেয়েমি এসে যেতে বাধ্য এবং ওসব গান তো অল্পবয়েসীদের জন্য নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মর্ম বোঝার মতন মানসিক গঠন না হলে ঐ গান ভালো লাগতে পারে না।

সেইজন্যই, উপায়ান্তর হয়ে, আমাদের এখানকার অল্পবয়সীরা হিন্দী গানে ডুব দিয়েছে। অনেক বয়স্ক লোক এজন্য বোকার মতন নাক সেঁটকায়। সত্যিই বোকার মতন, কারণ, ছেলেমেয়েদের কি দোষ, পুরো দোষ হচ্ছে তাদের, যারা হাস্যকর বা কুৎসিত ভাষায় আধুনিক বাংলা গান লেখে, যারা তাতে প্যানপ্যানে

সুর দেয় এবং যে-সব গায়ক-গায়িকা তা মিনমিন করে গায়। এখনকার ছেলেমেয়েদের তারা ধরে রাখতে পারেনি, আকৃষ্টও করতে পারেনি। আধুনিক বাংলা গানের গায়ক-সুরকাররা হিন্দী গানওয়ালাদের কাছে গো-হারান হেরে গেছে। দ্যাখো, হেরে গেছে, দুয়ো!

চিঠি এবং প্রণয়

আমার নামে কোনো চিঠি এলেই আমি প্রথমে ঠিকানার হাতেব লেখাটা কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখি। হাতের লেখা দেখেই চরিত্র অনুধাবন করার একটা বিজ্ঞান নাকি আছে শুনেছি, আমি সে বিষয়ে কিছু জানি না। তবে ঠিকানার লেখা দেখেই আমি বুঝতে পারি, সেটা কোনো ছেলে লিখেছে, না কোনো মেয়ে, কম বয়েস না বেশি বয়েস ইত্যাদি। অচেনা হাতের লেখা দেখলে সেই চিঠি আমি আগে খুলি।

সেই রকম একটা খাম ছেঁড়ার পর দেখলাম, ভেতরে আর একটা মুখবন্ধ খাম, তার ওপর লেখা, 'দয়া করে চিঠিটা মিনুকে দিয়ে দেবেন।'

মিনু আমার মাসতুতো বোন, এম. এ. পড়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, সাইকেল চালাতে পারে, শুধু কয়েকজন বান্ধবীর সঙ্গে গত যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ-সীমান্ত দেখতে গিয়েছিল, অর্থাৎ আধুনিকা যাকে বলে। কিন্তু নিজের বাড়ির ঠিকানায় তার বন্ধুদের চিঠি লিখতে বলতে পাবে না—এ কি রকম ব্যবহার। তার তিন-চার জন ছেলে বন্ধু আছে, তাদের নামও সে প্রায়ই বলে। মাঝে মাঝে তারা বাড়িতেও আসে—কিন্তু তারা চিঠি লিখলেই যত দোষ!

মিনুর মা, অর্থাৎ আমার সেজো মাসিমা নিজেই কলেজ-জীবনে বেশ প্রেমট্রেম করেছিলেন। আমার সেজো মেসোমশাইও বেশ উদার চরিত্রের মানুষ তবে বড্ড ভুলো মন, বাড়িতে যে-কোনো চিঠি এলে তিনি নিজেই হয়তো খুলেটুলে পড়েন, সেই কারণেই এই সতর্কতা।

পরের চিঠি পড়া মহাপাপ। আমার পাঠক-পাঠিকারা কক্ষনো পরের চিঠি পড়বেন না, আমি এই উপদেশ দিচ্ছি। কিন্তু লেখকদেব কথা আলাদা, তাদের হতে হয় অন্তর্যামীর ছোট ভাই, তা ছাড়া তাদের কৌতূহল বেশি থাকে। সুতরাং আমি সেই খামের আঠালাগানো জায়গাটা আঙুলে করে জল দিতে লাগলাম। অবিলম্বেই সেটা খোলা গেল।

মিনুর মুখে আমি সুরজিৎ, শান্তনু এবং রণজয়—এই তিনটি ছেলের নাম

প্রায়ই শুনেছি। মিনু অবশ্য ওদের কারুরই প্রশংসা করে না। কারুকে বলে ওপর-চালাক, কারুকে বলে ল্যাবা, এবং আর একজনকে বলে লালিমা পাল পুং। মেয়েরা ছেলেদের সম্পর্কে আড়ালে কি বলে, তা যদি ছেলেরা কখনো জানতে পারত!

যাই হোক, এই তিনজনের মধ্যে কে চিঠিটা লিখেছে, সেটাই আমার জানার উদ্দেশ্য। মিনু নিশ্চয়ই নিজেই তাকে চিঠি লিখতে বলেছে, না হলে এই পত্রলেখক আমার ঠিকানা কি করে জানবে!

চিঠিটার শেষে লেখা আছে, ইতি বাবলু। বোঝা গেল না, আমার নাম জানা ঐ তিনজনের মধ্যে কোন জন। কিংবা অন্য কেউও হতে পারে। আজকাল ছেলেমেয়েদের মধ্যে ডাক-নামে ডাকাডাকি করাই ফ্যাসান। আগে সবাই ডাকনাম লুকোতো—এখন অবশ্য ডাকনামগুলোও বেশ মিষ্টি মিষ্টি হয়।

'সচিত্র প্রেমপত্র' নামে বটতলা-প্রকাশিত একটা বই অনেক দিন আগে দেখেছিলাম। দরকার হলে ঐ বইটা থেকে কিছু টুকবো ভেবেছিলাম এক সময়, কিন্তু আমার অবশ্য প্রেমপত্র লেখার কোনো সুযোগই এল না এ পর্যন্ত। এখন আর ঐ বই থেকে কেউ টুকবেও না, কারণ প্রেমপত্রের ফ্যাসানই একদম বদলে গেছে। এখন আর সম্বোধনে হৃদয়েশ্বরী, প্রাণেশ্বরী বা অচিনপাখি কিংবা দখিনা বাতাস এসব কিছুই থাকে না, এখন শুধু নাম।

এককালে প্রণয়-পর্বে আপনি থেকে তুমিতে নামার ব্যাপারেই একটা বিরাট সমস্যা ছিল, এখন সেসব ঝঞ্ঝাট নেই। বাবলু মিনুকে লিখেছে তুই বলে, হঠাৎ মনে হতে পারত ভাই-বোনের ব্যাপার—যদি না জানতুম যে এখনকার কলেজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে তুই বলাই ফ্যাসান।

দুটি মাত্র বানান ভুল! আমি আরও বেশি থাকবে আশা করেছিলাম। প্রেমপত্রে বানান ভুল কোনো দোষের ব্যাপার নয়, অনেক সময় জানা বানানই ভুল হয়ে যেতে পারে। চিঠিটাতে কোনো গদগদ ব্যাপার কিংবা শারীরিক প্রসঙ্গ নেই, মিনু যে বাবলুকে সাঙ্ঘাতিক ভুল বুঝেছে, বাবলু সেই ভুল ভাঙাবারই চেষ্টা করেছে। প্রণয়পর্বে ভুল বোঝাবুঝিই জুড়ে থাকে পঁচাত্তরভাগ সময়। এত স্পর্শকাতর হয়ে থাকে মন যে, যে-কোনো তৃতীয় নারী-পুরুষের প্রসঙ্গ এলেই মনে হয়, সে বুঝি সব জয় করে নিল।

চিঠিটা হাতে নিয়ে বসেছিলাম অনেকক্ষণ, হঠাৎ আমার চমক ভাঙল। মনে মনে কিছুক্ষণের জন্য আমিই বাবলু হয়ে গিয়েছিলাম। যেন আমিই চিঠিটা লিখেছি, মিনুকে নয়, পৃথিবীর সমস্ত নারীকে মিলিয়ে যে একজন নারী হয়, তাকে। যেন আমাকেও কেউ ভুল বুঝেছে, সেই ভুল ভাঙাবার জন্য আমি মনে মনে লিখে যাচ্ছি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, অনেক বানান ভুল হয়ে যাচ্ছে। ঘোর ভাঙতেই লজ্জা

পেয়ে গেলাম। মিনু যদি এক্ষুনি এসে পড়ে? তাড়াতাড়ি খামটা আবার আঠা দিয়ে জুড়ে ঠিকঠাক করে রাখলাম।

জানতাম মিনু সেইদিনই আসবে। এল সন্ধের দিকে। অনেকদিন আগে আমার বাড়ি থেকে একটা গল্পের বই নিয়ে গিয়েছিল, মিনু এমন ভাব দেখালে যে হঠাৎ সেই বইটা ফেরত দেবার কথা ওর মনে পড়েছে।

আমি খুব সাধারণ গলায় বললাম, তোর একটা চিঠি আছে, এই নে।

খামটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। মিনু ভুরু কুঁচকে বলল, আমার চিঠি। তুমি কোথায় পেলে?

যে-কোনো মেয়েই গ্রেটা গার্বো কিংবা সুচিত্রা সেনের সমান অভিনেত্রী। নেহাত তারা সবাই দয়া করে সিনেমায় নামে না। মিনুর ভুরু কোঁচকানো বিস্ময়টা আমার কাছেও সত্যি বলে মনে হয়।

ভেবেছিলাম খামটা ও বাড়ি নিয়ে যাবে। কিন্তু মিনু বেশ একটা অবহেলার ভাব দেখিয়ে আমার সামনেই খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা বার করে পড়তে লাগল। আমি তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করতে লাগলাম ওর মুখভঙ্গি। কিছুই বোঝবার উপায় নেই। মিনু কি নির্জনে জানলার ধারে বসে চিঠিটা পড়তে পারত না। ছেলেটা অত যত্ন করে লিখেছে।

মিনু চিঠিটা পড়া শেষ করে সেটা মুড়ে ফেলল। আমি আশা করেছিলাম, সেটাকে ও বুকের মধ্যে রাখবে। মেয়েরা বুকের মধ্যে টাকাপয়সা রাখে অনেক সময়, আর একটা চিঠি রাখতে পারে না। এ রকম চিঠির ঐটাই তো সবচেয়ে যোগ্য জায়গা।

মিনু তার বদলে হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, তুমি পড়বে?

আমি রীতিমতন চমকে গিয়ে বললাম, কেন রে, তোর চিঠি আমি পড়ব কেন?

মিনু হাসতে হাসতে বলল, তোমার নিশ্চয়ই খুব কৌতূহল হচ্ছে। ভাবছ, বুঝি কোনো প্রেমপত্র-টত্র হবে--

—তা নয় বুঝি?

—মোটেই না। এখন তো ক্লাস বন্ধ, তাই আমার এক বন্ধু লিখেছে যে আগামী সোমবার আমরা একজন প্রফেসারের বাড়িতে দেখা করে—

—তাহলে আমার বাড়িতে চিঠি কেন?

মিনু অম্লানমুখে বলল, আমার ঠিকানা জানে না। একদিন এই রাস্তা দিয়ে এর সঙ্গে যেতে যেতে তোমার বাড়িটা আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলাম—

কথা বলতে বলতে মিনু টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল চিঠিটা। তারপর বারান্দায় গিয়ে বাইরে উড়িয়ে দিয়ে এল। আমাকে ও খুব জব্দ করেছে, ওর কথায়

প্রতিবাদ করার মুখ নেই আমার।

কিন্তু বাবলুর জন্য আমার খুব কষ্ট হতে লাগল। মেয়েরা এত নিষ্ঠুর হয়। এত যত্ন করে লেখা চিঠি, তার মূল্য শুধু এইটুকু। কিংবা চিঠি ছিঁড়ে ফেলাই আধুনিকতম ফ্যাসান হয়তো!

দ্বীপের ঠিকানা

ভাবতে কি খারাপ লাগে যে, পৃথিবীতে কোথাও আর একটাও অচেনা-অজানা দেশ নেই। জাহাজ চালাতে চালাতে কোনো ক্যাপ্টেন আর কখনো হঠাৎ কোনো তটরেখা বা দ্বীপের কাছে এসে বলবে না, আরে এ জায়গাটা তো কোনো ম্যাপে নেই! এখানে একটা পতাকা উড়িয়ে দেওয়া যাক।

সমস্ত দ্বীপ সমস্ত স্থলভাগ মানুষের চেনা হয়ে গেছে, জরীপের হিসেবে লেখা আছে তার আয়তন, মালিকানাও নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের আবিষ্কারের জন্য কোনো নতুন দেশ আর বাকি রাখেনি, এজন্য কলম্বাস, ক্যাপ্টেন কুক, লিভিংস্টোন, এমাণ্ডসেনদের ওপরে মাঝে মাঝে এত রাগ হয়!

বেশ কয়েকবার মানুষ চাঁদে যাচ্ছিল, তাও হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। আর টাকা নেই। সুতরাং মঙ্গল বা বুধ গ্রহে মানুষের যাত্রা বোধহয় আমাদের এই জীবনে আর দেখা গেল না। আর গেলেই বা কি হতো, সেখানে যাবার অধিকার থাকত শুধু সাহেবদেব।

সমস্ত পৃথিবীটা সাদা, কালো এবং পীত রঙেব জাতিরা ভাগ করে নিয়েছে। আমরা অর্থাৎ ভারতীয়, বাঙলাদেশী, পাকিস্তানী, ইরানী এবং আরবদেশীয়রা হয়তো ঠিক কালো নই। খানিকটা খয়েরি বলা যায়, আমরাও অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছি বটে—কিন্তু গণ্ডগোলের সময় ছাড়া আমাদের কেউ গ্রাহ্য করে না। আমরা খয়েরিরা, কালোদের কখনো পছন্দ করিনি। কাব্যসাহিত্যে বন্দনা করেছি গৌরবর্ণ তনুর, বাস্তবেও কাঁধ ঘেঁষাঘেঁষি করতে চাই ফর্সা সাহেবদের সঙ্গে, তাদেরই আচার-ব্যবহার অনুকরণ করি কিন্তু তারা অবশ্য আমাদের পাত্তাই দেয় না, কখনো দয়া করে ছিটেফোঁটা করুণা বিলায় মাত্র। এদিকে পীত জাতির মধ্যে জাপান অর্থ-গৌরবে অহংকারী হয়ে প্রাচ্যের সাহেব হয়েছে। চীনও সাম্যবাদী হবার পর এখন আর কাছাকাছি কালো বা খয়েরিদের নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না, তারা দু'হাতে রাশিয়া ও আমেরিকার সঙ্গে লোপালুপি খেলা খেলছে। শুধু আমরাই এখন দুয়োরানীর সন্তান।

বাসের ভিড়ের মধ্যে অনেকদিন বাদে পারমিতাকে দেখলাম। এখনো বুক কাঁপে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে। মনে হয় এতদিন পারমিতাকে না দেখেও কি করে আমি বেঁচে ছিলাম?

ভিড় ঠেলে পারমিতার কাছে যাবার চেষ্টা করি। চোখে চোখ পড়ে। নীরব দৃষ্টিতে পারমিতা হয়তো কিছু বলতে চায়, কিন্তু চোখের ভাষা পড়তে বরাবরই আমার ভুল হয়ে যায়। আমাকে আরো এগোতে দেখে পারমিতা আস্তে আস্তে মুখটা ফিরিয়ে নেয় জানলার দিকে।

অতি ব্যস্ত হবার জন্যই এক ভদ্রলোকের কনুইয়ের ধাক্কা লাগে আমার ঠোঁটে। এ জন্য বোধহয় আমারই ক্ষমা চাওয়া উচিত, তার আগেই ভদ্রলোক দুঃখ প্রকাশ করেন। কিন্তু আমি তাঁকে দেখে চমকে উঠলাম। ইনি পারমিতার মামা, আমাকে কোনোদিন পছন্দ করেননি। সেইজন্যই পারমিতা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পারমিতার মামা তো কোনোদিন ট্রামে-বাসে চড়তেন না, মনে পড়ল, আজ ট্যাক্সি ধর্মঘট।

আমি পরের স্টপেই বাস থেকে নেমে পড়লাম আর একবার তাকালাম পারমিতার দিকে, তার সিঁথিতে সিঁদুরের লাল বিন্দুটা যেন একটা আগুনের ফুলকির মতন ছুটে এল আমার দিকে।

পারমিতার বিয়ের সময় তো আমি বাধা দিইনি। কোনোদিন কোনো উপদ্রব করিনি ওদের বাড়িতে। পারমিতার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের কথা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল বলেই বিয়ের পর আমার সঙ্গে দেখা করা একেবারে নিষিদ্ধ হয়েছে পারমিতার জীবনে।

আমি তো আর কিছু চাই না, শুধু একটু কথাও বলতে পারব না! একটুক্ষণ কথা বলতে কি এমন অপরাধ?

সিগারেট ধরিয়ে একা-একা হাঁটতে থাকি রাস্তা দিয়ে। পারমিতাকে ভোলার জন্য আমি বিশ্ব-সমস্যার কথা চিন্তা করি। সারা পৃথিবী জুড়ে এখন খাদ্য-সমস্যা চলেছে। পেট্রোলের দরবৃদ্ধিতে সভ্যতার ভিত কেঁপে গেল। দিয়েগো গারথিয়া দ্বীপে মার্কিনীরা আণবিক অস্ত্রের ঘাঁটি বানাচ্ছে। আমাদের এখানে খাদ্য নেই, বিদ্যুৎ নেই, অফিসে, বাড়িতে এমনকি হাসপাতালেও শান্তি নেই। মানুষের কত রকম দুঃখ। সেখানে পারমিতার মতন একটি সামান্য মেয়ের সঙ্গে আমার মতন একজন সামান্য মানুষের দেখা হলো কি হলো না, এটা কি কোনো সমস্যা হতে পারে?

তবু মনের মধ্যে একটা ঝিরঝিরে ব্যথা ঘুরতেই থাকে। ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হয়ে যাই। দু'তিন দিন ধরে সেই বাসের রুটে ঘোরাঘুরি করি যদি পারমিতার সঙ্গে একবার দেখা হয়ে যায়।

দেখা হয় একমাস বাদে। শুনেছি, বিদেশ চলে যাবে। তার আগে বোধহয়

পারমিতাকে আর একা রাস্তায় বেরুতেই দেয় না। আজও ওর সঙ্গে রয়েছে ওর দেওর!

পারমিতার দেওর বোধহয় আমাকে চেনে না। পারমিতাকে ফুটপাথে দাঁড় করিয়ে সে ছুটে গেল ট্যাক্সি ধরতে। সেই ফাঁকে আমি পারমিতার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছ?

খুবই ক্লান্ত ও কোমলভাবে পারমিতা চোখ তুলল, দু'এক মুহূর্ত চেয়ে রইল স্থিরভাবে। এবারও আমি ওর চোখের ভাষা বুঝতে পারলাম না।

আস্তে আস্তে বলল, এই প্রশ্নের উত্তরে কেউ কি বলে খারাপ?

আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। খুব বেশি তো সময় নেই যে এ রকম ঘোরালো কথার মানে বুঝব।

আমি আবার বললাম, পারমিতা, তোমার সঙ্গে আমি একদিন কথা বলতে চাই।

—কোথায়?

এই সময় ঝপ করে পাশে একটা ট্যাক্সি থামল। একটি তরুণ কণ্ঠ বলল, বৌদি, উঠে আসুন। পারমিতা চলে গেল।

আমি বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। পারমিতার ঐ একটি কথাই মাথার মধ্যে প্রবল শব্দ করতে লাগল। কোথায়? কোথায়? পারমিতার সঙ্গে কোথায় দেখা করা যায়? কোনো পার্কে, ময়দানে, হোটেলে? কোনো জায়গাই পছন্দ হয় না। কোনো জায়গাটাই যেন ঠিক পারমিতার সঙ্গে দেখা করার যোগ্য নয়। পারমিতার জন্য একটা আলাদা নতুন কোনো দেশ দরকার—যেখানে অন্য কোনো চোখ নেই। আজই, পৃথিবীতে আর একটাও নতুন দেশ বাকি নেই বলে আমি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি।

তারপর ঘুরতে ঘুরতে চেনাশুনো সকলের থেকে দূরে যখন সম্পূর্ণ একা হয়ে যাই, বাতাস হালকা হয়ে আসে, অদৃশ্য কোথায় ঝনঝন করে শব্দ হয়, সেই মুহূর্তে আমি একটা নতুন দ্বীপের সন্ধান পেয়ে যাই।

বেলাভূমিতে আছড়ে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউ, রুক্ষ পাথরের স্তূপের ওপাশে বনতুলসী গাছের ঝাড় হয়ে আছে। তারপর বহুদূর বিস্তৃত সমতল প্রান্তর, মাঝে মাঝে একটা দুটো দেবদারু গাছ, আর অজস্র ফড়িং সেখানে। তাদের ডানার শন শন শব্দে, ঠিক ঝড়ের মতন নয়, অন্য এক আবহাওয়া তৈরি হয়। সেখানে পারমিতা আমার দিকে হাতছানি দিয়ে বলে, তুমি কি কথা বলবে বলছিলে আমাকে?

আমার কোনো কথা মনে পড়ে না। আমি এই পৃথিবীর সব দুঃখ, খাদ্য, বস্ত্র,

বিদ্যুতের সমস্যা কিংবা আণবিক অস্ত্রের কথাও সম্পূর্ণ ভুলে যাই। বার বার শুধু মনে হয়, বেঁচে থাকাটা কি সুন্দর!

সেই দ্বীপের ঠিকানা আমি অন্য কারুকে জানাতে পারি না।

উপহারের কলম

আমার এক অভিন্নহৃদয় বন্ধু আগে কবিতা-টবিতা লিখত। এখন গল্প-উপন্যাসই বেশি লেখে, একটু নামও হয়েছে। সে যখন কবিতা লিখত, তখন যথারীতি সে ছিল সমাজে অবহেলিত, আত্মীয়-স্বজনরা তার দিকে কৃপার দৃষ্টিতে তাকাত, অনাত্মীয়রা তাকে পাত্তাই দিত না—দু'একজন বন্ধুবান্ধব শুধু তার রচনার তারিফ করেছে কখনো কখনো—তাও বিনা দ্বিধায় নয়। এখন তার গল্প-উপন্যাস দু'চারটে সিনেমা পত্রিকায় ছাপা হয় বলে তার নাম শুনলে কেউ কেউ চিনতে পারে।

একদিন বন্ধুটি আমার বাড়িতে এসে বলল, এই—তোর পেনের দরকার আছে? তোকে একটা পেন দিতে পারি।

আমার বছরে সতেরোটা কলম হারায় কিংবা নিব ভাঙে। তাছাড়া বিনা পয়সায় কোনো জিনিস পেলে কার না নিতে ইচ্ছে হয়? ভাবলুম বছরের গোড়ায় অনেক কোম্পানি ক্যালেণ্ডার, ডায়েরি কিংবা কলম উপহার দেয়—লেখক বন্ধুটি বোধহয় দু'তিনটি কলম পেয়ে আমাকে একটি দিতে চাইছে।

হাত বাড়িয়ে বললাম, ভীষণ দরকার। দে, দে!

কলমটা পেয়ে অবাক হলাম। নতুন নয়। পুরোনো এবং কম দামী। ক্লিপটা বাঁকা। বছরের গোড়াতেই এ রকম রসিকতার মর্ম বোঝা শক্ত। কলমটা খুলে সেটা দিয়ে লেখার চেষ্টা করে দেখলাম নিবটা ঠিকই আছে।

ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার?

বন্ধুটি হাসতে হাসতে বলল, কলমটা নিয়ে একটা মজার ব্যাপার আছে। এটা আমার কাছে অদ্ভুতভাবে এসেছে কিন্তু এটা আমার কাছে রাখতে চাই না।

আমি আর উচ্চবাচ্য না করে কলমটা নিয়ে অবহেলার সঙ্গে টেবিলের ওপর রাখলাম। তারপর প্রসঙ্গ বদলে বললাম, জানিস তো পেট্রোলের দাম আবার বাড়ছে। তার মানেই সব জিনিসপত্তরের দাম আবার বাড়বে। তার মানে, সামনে যে কি দুঃসময় আসছে।

এই চলতি বিষয়ে মিনিট পাঁচেক কথাবার্তা চলল। বন্ধুটি ঠিক যেন স্বস্তি পাচ্ছে না, উসখুস করতে লাগল। তারপর এক সময় দুম করে বলে ফেলল,

তুই জিজ্ঞেস করলি না তো, কলমটা আমি কি করে পেলাম!

আমি তো জানিই, বন্ধুটি ঐ গল্পটি বলার জন্য আজ এসেছে। আমি তখন জিজ্ঞেস করলেই বরং ধানাইপানাই করত। এখন ওরই পেট ফুলে উঠেছে।

বললাম, লেখকরা কলম দিয়ে অনেক মিথ্যে গল্প বানিয়ে বানিয়ে লেখে। সেগুলো আমাদের পড়তে হয়। কোনো লেখকেব নিজের মুখ থেকে মিথ্যে গল্প আমি শুনতে চাই না।

—এটা সত্যি। তাছাড়া এটা আমার গল্প নয়, ঐ কলমটার গল্প। দিন সাতেক আগে একদিন সন্ধের পর বাড়ি ফিরছি, দেখি, আমাদের ফ্ল্যাটের দরজার বাইরে কলমটা পড়ে আছে। সঙ্গে একটা চিঠি। চিঠিটাতে লেখা আছে, 'এই কলমটা আমরা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি। আপনাকে দিয়ে গেলাম। অনেকদিন তো আপনি কবিতা লেখেননি। দেখুন যদি এই হারানো কলমে আপনার কবিতাকে আবার খুঁজে পান!'

—নাম সই নেই?

—না। শুধু লেখা আছে, 'আমরা তিনজন'। তিনটি মেয়ে লিখেছে।

—কি করে বুঝলি মেয়ে?

বন্ধুটি একটু লজ্জা পেয়ে গেল। তারপর বলল, হাতের লেখাটা অনেকটা মেয়েলি ধরনের। তাছাড়া, মেয়ে হিসেবেই ভাবতে ভালো লাগে। একটা মস্ত বড়ো কাগজে শুধু তিন লাইনের চিঠি—

—ঠিক আছে, এটা দিয়ে কবিতা লিখলেই তো পারিস!

—তুইও এ-কথা বললি? আমার ট্র্যাজিডি কি জানিস না? যখন কবিতা লিখতাম, তখন সকলেই বলত, কবিতা লিখে কি হবে। কবিতা তোমার হাতে ঠিক আসে না। গদ্য লেখার চেষ্টা করে দ্যাখো। এখন গদ্য লিখছি—এখন সকলে বলছে, গল্প-উপন্যাসে তোমার একেবারেই হাত নেই—বরং কবিতাটি মন্দ ছিল না--

এবার আমি হেসে উঠলাম। বন্ধুটি আহতভাবে একটুক্ষণ চুপ করে রইল। সিগারেট টানতে লাগল আপনমনে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, গল্পটা কি এখানেই শেষ।

ও মুখ ফিরিয়ে বলল, না। এই ঘটনার দিন চারেক বাদে আমি আর একটি চিঠি পেলাম ডাকে। এবারেও মস্ত বড়ো একটা সুদৃশ্য কাগজে কয়েক লাইন। 'গলফ ক্লাব রোডের পাশে একটা মাঠে আমরা বসে আছি। সন্ধে হয়ে এসেছে। আমরাই আপনাকে কলমটা দিয়ে এসেছিলাম। কবিতা লিখলেন? ইতি আমরা তিনজন।'

—এ তো রীতিমতন রোমান্টিক ব্যাপার দেখছি। এই 'আমরা তিনজন' যদি সত্যিই তিনটি মেয়ে হয় তাহলে ওদের নিরাশ করা মোটেই উচিত নয়।

—মেয়ে নিশ্চয়ই। হাতের লেখা ছাড়াও, এ রকম চিঠি কি ছেলেরা লেখে!

—আমি কি করে জানব? আমি কি কখনো কোনো মেয়ের চিঠি পেয়েছি? তা ওদের উদ্দেশ্য করে একটা কবিতা লিখলেই তো পারিস। কবিতা লিখতে কি একদম ভুলে গেছিস?

—না। তা নয়। অন্যদিকে একটা গোলমাল হয়েছে। আমার বৌদিকে কলমটার ব্যাপার নিয়ে গল্প করেছিলাম। বৌদি দারুণ চটে গেছেন।

—কেন, মেয়েরা দিয়েছে বলে?

—উঁহুঃ। বৌদির সেসব দোষ নেই। বৌদি বলছেন, কুড়িয়ে পাওয়া কলম আবার কেউ কাউকে উপহার দেয় নাকি? তাও সস্তা বাজে কলম, ক্লিপটা ব্যাকা। এটা একটা অলক্ষুনে ব্যাপার।

—যদি খুব দামী গোল্ড ক্যাপ কলম হতো, তাহলে বোধহয় আর অলক্ষুনে থাকত না?

—অত দামী কলম হলে কেউ আমাকে দিতই না। মেয়েরাও না। যাই হোক, বৌদি বললেন, কলমটা আমাদের ঝিয়ের ছেলেকে দিয়ে দিতে। কিন্তু যাই বল, একটা উপহার পাওয়া জিনিস কি ঝিয়ের ছেলেকে দেওয়া যায়! তাকে আমি আর একটা কিনে দিয়েছি।

—আর সেইজন্যই বুঝি ঝিয়ের ছেলের বদলে আমাকে নির্বাচন করেছিস?

—কি করব, বৌদি যে কলমটা বাড়িতে রাখতেই দেবে না।

আমি আপত্তি করলাম না। রেখেই দিলাম কলমটা আমার কাছে। টেবিলের ওপরেই কলমটা পড়ে রইল, আমি ওটার কথা ভুলে গেলাম। কলমটা ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজনই আমার হয়নি।

কয়েকদিন বাদে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরেছি, আমার ছোট ভাই লাফাতে লাফাতে এসে বলল, ছোড়দা, একটা কবিতা শুনবে?

আমি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম, কবিতা? হঠাৎ?

—এই দ্যাখো না। আমি নিজে লিখেছি। আজই দুপুরে লিখলাম।

আমার ছোট ভাইয়ের হাতে একটা গত বছরের পুরোনো ডায়েরি আর সেই ক্লিপ-ব্যাকা কলমটা।

আমার ছোট ভাই কক্ষনো কবিতা-টবিতা লেখেনি এর আগে। এরকম কোনো চিন্তাই ওর মাথায় ছিল না। কলমটায় কি কোনো জাদু আছে? আমার বন্ধু ওটা দিয়ে কবিতা না লিখলেও আমার ছোট ভাইকে দিয়েই শেষ পর্যন্ত কবিতা লেখাল!

কলমটা নিয়ে এলাম ওর হাত থেকে। খুব একটা বকুনি দিলাম। মনে মনে তক্ষুনি ঠিক করলাম, আমার ছোট ভাইয়ের ভবিষ্যৎটি যাতে নষ্ট না হয়, সেইজন্য অবিলম্বে এই কলমটি অন্য কোথাও পাচার করতে হবে। কাকে দেওয়া যায়? কাকে দেওয়া যায়? কোনো জজ সাহেবের হাতে কলমটা গুঁজে দিয়ে এলে কেমন হয়?

নির্জন নির্জন বাড়ি

ছেলেবেলায় অনেক কিছু দেখেই মুগ্ধ হতাম। সেই মুগ্ধতাবোধ এখন আর নেই। আমরা যতই অভিজ্ঞ হয়ে উঠি নিজেদের চালাক ভাবতে শুরু করি—ততই আমাদের অবাক হবার শক্তি চলে যায়। আজকাল প্রায়ই আমাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, এমন কিছু নয়!

এখনো পর্যন্ত যে কয়েকটি জিনিস দেখলে আমার সত্যিই ভালো লাগে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে, শূন্য বাড়ি। মানুষহীন বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলে সব সময়েই আমার অন্য রকম একটা অনুভূতি হয়। মানুষহীন বাড়ি বলতে অবশ্য সাময়িকভাবে ফাঁকা বাড়ি কিংবা যেসব বাড়ি ভাড়ার অপেক্ষায় আছে সেগুলির কথা বলছি না। প্রকৃতই পরিত্যক্ত এবং নির্জন—যেমন বহু ঐতিহাসিক দুর্গ কিংবা রাজপ্রাসাদ কিংবা দেবতাহীন মন্দির অথবা যে-কোনো সাধারণ বাড়িও হতে পারে।

এরকম বাড়ি বেশ কিছু দেখে ছিলাম বিগত একাত্তর সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়। সীমান্ত পেরিয়ে কয়েকজন গিয়েছি ওপারে, দেখেছি পড়ে আছে অনেক গৃহস্থবাড়ি, তখন সম্পূর্ণ জনশূন্য, কিছুটা অগ্নিকাণ্ড বা লুণ্ঠনের চিহ্ন রয়েছে, অধিবাসীদের কোনো খবর নেই। বাগানের পাশের পথ দিয়ে ঢুকেছি বাড়ির মধ্যে, অপরের বাড়ি, তবু অনুমতি নেবার প্রশ্ন নেই, পুকুরের শান্ত জলে শালুক ফুলের ওপর খেলা করছে ফড়িং, বারান্দায় পড়ে আছে পুরনো খবরের কাগজ, দেয়ালে লেখা আছে, গয়লা সাড়ে তিন টাকা। সে বাড়িতে কারা ছিল জানি না। তবু যেটাকে শয়নঘর মনে হয়, সেখানে ঢুকে যখন দেখতে পাই অসংখ্য ছেঁড়া চিঠি ও একটা চুলের কাটা, তখন শরীরটা শিরশির করে ওঠে। কোথাও একটা ভাঙা জানলায় খটখট শব্দ হলেই চমকে উঠি। আগ্রা দুর্গে বেগমদের স্নানের ঘরে প্রবেশ করার রোমাঞ্চের চেয়েও এই রোমাঞ্চ কম নয়।

তবে ইতিহাস কিংবা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত বাড়িই নয়, আরো এরকম অনেক খালি বাড়িতে ঢুকে আমি এরকম রোমাঞ্চ পেয়েছি। অনেক দিন আগে দমদমের

দিকে ট্রেনে চড়ে যাবার সময় মাঠের মধ্যে একটা দোতলা বাড়ি প্রায়ই আমার চোখে পড়ত। বেশ বড়ো বাড়ি এবং দেখলেই বোঝা যেত ওখানে কোনো লোক থাকে না। প্রত্যেকবার ওদিক দিয়ে যাবার সময় আমি জানলা দিয়ে উৎসুকভাবে তাকিয়ে থাকতাম। সে জায়গাটা স্টেশনে থেকে বেশ দূরে। একদিন কি কারণে, সম্ভবত সিগন্যাল না পেয়ে, ট্রেনটা ওখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি আর দ্বিধা না করে ট্রেন থেকে নেমে মাঠ ভেঙে এগুতে লাগলাম সেই বাড়িটার দিকে।

মাইলখানেক হাঁটতে হয়েছিল। কাছে গিয়ে দেখলাম, সেটা কোনো জমিদারের বাগানবাড়ির মতন, বিরাট থামওয়ালা সিংহের মুখ বসানো গেট, একটি বাগান আগাছায় ভর্তি, তার মধ্য দিয়ে সুরকি-ঢালা পথ। অবশ্য বাড়িটার দরজা-জানলা বিশেষ নেই, লোকে ভেঙে নিয়ে গেছে। দেয়াল দিয়ে উঠেছে বট অশ্বত্থের মোটা মোটা গাছ। জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই ধারে-কাছে। তবু বিরাট চওড়া সিঁড়ি এখনো অনেকটা অক্ষত আছে, ঘরগুলো একেবারে বাসের অযোগ্য নয়। তাহলে অন্য কেউ এসে বাড়িটাকে জবরদখল করে নেয়নি কেন?

একটি কারণই মনে আসে। নিশ্চয়ই ভূতুড়ে বাড়ি হিসেবে বদনাম আছে। আমি যখন পৌঁচেছি তখন গনগনে দুপুর। ঠিক দুপুরবেলা, ভূতে মারে ঠ্যালা। আমার যে একটুও গা ছমছম করেনি তা বলতে পারি না। তবু যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতন আমি উঠে গেলাম ওপরে। বিরাট চওড়া বারান্দা, একটা ভাঙা আয়নার হাজার টুকরো কাঁচ ছড়িয়ে আছে। এবং অনেক বইয়ের ছেঁড়া পাতা, ময়লা কাপড়ের টুকরো, বাতিল খেলনা। ভূত-টূত কিছু দেখিনি, তবু আমার শরীরের সমস্ত রোমকূপ শিহরিত হচ্ছিল। সেই খানিকটা ভয় ও কল্পনা-মেশা রোমাঞ্চ আমি এত বেশি উপভোগ করছিলাম যে, আমি সেখানে থেকে গিয়েছিলাম প্রায় ঘণ্টা দু'এক। ট্রেন ছেড়ে গেছে অনেকক্ষণ।

সেই বাড়িতে কিছু পায়রা ও শালিকের বাসা ছাড়াও আমি প্রাণের চিহ্ন পেয়েছিলাম। দোতলার সিঁড়ির পাশের সবচেয়ে বড়ো ঘরটার কোণ থেকে দারুণ খচমচ শব্দ পেয়ে আমি দারুণ চমকে উঠেছিলাম ঠিকই, তাহলেও উঁকি মেরে দেখেছিলাম ভেতরে। যাঁরা ভূতের গল্প লেখেন, তাঁরা এই জায়গাটায় অনেকখানি রহস্যময় বর্ণনা দিতেন, কিন্তু আমি দেখতে পেয়েছিলাম একটা কুকুর।

আমি ভূতের চেয়েও কুকুরকে বেশি ভয় পাই। সুতরাং আমার ভয় পাবার কারণ ছিল। কিন্তু কুকুরটা খুবই বুড়ো, আমায় দেখে তর্জন-গর্জন কিছুই করল না—অলস চোখ মেলে শুয়েই রইল। এটা ঠিক সাধারণ নেড়িকুত্তা নয়, বেশ বড়ো আকারের, একদা বংশমর্যাদা ছিল, এখন লোম-ওঠা, প্রায় অথর্ব। কুকুর সাধারণত মানুষের আশেপাশেই থাকে। এই কুকুরটা জনহীন পরিত্যক্ত বাড়িতে রয়ে গেছে

কেন? কলকাতা থেকে খুব বেশি দূরে নয় এমন জায়গায় এত বড়ো একটা বাড়িকে এরকমভাবে নষ্ট হতে দেওয়া হচ্ছে কেন? তখনই মনে হয়, নিশ্চয়ই এই বাড়িটার সঙ্গে কোনো গল্প জড়িত আছে। সেই গল্পের সামান্য সূত্রও আমি জানি না, বাড়ির পূর্বতন মালিকদের সম্পর্কেও আমার কোনো ধারণা নেই। তবু সেই দুপুরে, সেই নির্জন পোড়ো বাড়ির বারান্দায় বসে আমি অজানা এক গল্পের স্বাদ পাচ্ছিলাম।

এরকম পরিত্যক্ত বাড়ি আজকাল সহজে চোখে পড়ে না। ভূতুড়ে বাড়ি, হানা বাড়ি—কিছুই আজকাল আর খালি থাকে না। ওরাং ওটাং গণ্ডার চিত্রল হরিণ প্রভৃতি বিরল প্রাণীর মতন ভূতরাও পৃথিবী থেকে আস্তে আস্তে অপসৃত হয়ে যাচ্ছে। ভূত সংরক্ষণের জন্যে কোনো সমিতিরও মাথাব্যথা নেই।

কয়েকদিন আগে হাওড়া জেলার সামতাবেড়ে গ্রামে শরৎচন্দ্রের বাড়ি দেখতে গিয়েছিলাম। না, সেটা হয়তো সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত বাড়ি নয়, সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শরৎচন্দ্রের কোনো উত্তরাধিকারী যেখানে পাহারাদার হিসেবে থাকতেও পারেন। কিন্তু আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন সে-রকম কারুকে দেখিনি। অনেক ঘর তালাবন্ধ, তবু সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যাওয়া যায়। বাড়িটিতে বহু দিনের ধুলো ও অযত্ন জমে আছে, ধানের গোলা, রান্নাঘর—সব কিছুরই পরিত্যক্ত চেহারা। দেখলেই বোঝা যায় এককালে একটি চমৎকার বাড়ি ছিল, সামনে বিরাট দিঘি ও বাগান, বারান্দায় দাঁড়ালেই অদূরের রূপনারায়ণ নদ দেখা যায়, রোদ্দুরে ঝকঝক করছে জল। বারান্দায় একটুক্ষণ দাড়ালেই অনুভব করা যায় এইখানে ইজিচেয়ার পেতে বসে থাকতেন শরৎচন্দ্র, তাকিয়ে থাকতেন নদীর দিকে—ঠিক যে-রকম বর্ণনা আছে তাঁর চিঠিপত্রে। যেহেতু বাড়িটাতে কোনো নতুন গৃহস্থালির চিহ্ন নেই, কোনো রমণীর কাপড় শুকোচ্ছে না, কোনো শিশুর খেলনা নেই—তাই অনায়াসেই কল্পনা করা যায়, শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে বাড়িটা এই রকমই পড়ে আছে, এখনো এখানকার হাওয়ায় ভাসছে সেদিনকার নিশ্বাস। ক্লান্ত বিপ্লবীর মতন একজন মানুষ এখানে এসে শান্তি চেয়েছিল। পায়নি।

শরৎচন্দ্রের বাড়িটি দেখে আমার অন্য একটি বাড়ির কথা মনে পড়েছিল। যদিও দুটি বাড়ির মধ্যে আপাতত কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবু মনে পড়েছিল, স্মৃতির কি যুক্তি থাকে সব সময়!

সেই বাড়িটি আমি দেখেছিলাম রামগড় শহর থেকে কিছুটা দূরে। হাজারিবাগ থেকে রামগড় আসার পথে জঙ্গল ও পাহাড়ী এলাকায়, হঠাৎ সেই বাড়িটা চোখে পড়ে। কয়েক বন্ধু মিলে আমরা গাড়িতে আসছিলাম, বাড়িটা দেখেই আমার কৌতূহল জাগ্রত হলো, গাড়ি থামিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। বাড়িটা দেখতে খুবই সুন্দর, মূল রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে জঙ্গল-ঘেরা টিলার ওপরে সাদা

বাড়িটা দূর থেকে একটা বিশাল ফুলের মতন দেখায়। তবে, নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন না হলে কেউ ঐরকম জায়গায় বাড়ি করে না। কাছাকাছি হাটবাজার তো দূরের কথা, জনবসতিও নেই—সে-কোনো একটা ছোটখাটো জিনিস কেনার দরকার হলেও অন্তত সাত-আট মাইল যেতে হবে, তার মধ্যে প্রায় দু'মাইল হাঁটা রাস্তা।

দূর থেকেই বোঝা গিয়েছিল, কাছে গিয়ে আরো নিশ্চিন্ত হলাম যে বাড়িটাতে বেশ কয়েক বছর কোনো মানুষ থাকেনি। আগাছা ও কাঁটাগাছে গেটের সামনেটা ঢেকে গেছে, মূল দরজাটা হাট করে খোলা।

আগাছা সরিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। বেশ শৌখিন ধরনের বাড়ি, বাড়ির মালিকের রুচিবোধ ছিল। ভেতরে ঢুকে আমরা ক্রমশ অবাক হতে লাগলাম। মোট চারখানা ঘর কিন্তু প্রত্যেক ঘরেই সাংঘাতিক এক ধ্বংসের চিহ্ন। ঘরগুলি চেয়ার টেবিল আলমারিতে সাজানো ছিল এক সময়, কিন্তু সে-সবকিছু টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। মনে হয়, কে যেন প্রচণ্ড ক্রোধে একটা কুড়ুল দিয়ে সেগুলো ফালা-ফালা করেছে। এমনকি দেয়ালের গায়ে লাগানো তাকও সেইরকম কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা। প্রত্যেকটা ঘরে একই দৃশ্য। একটা ঘরে মনে হলো প্রায় হাজারখানেক বই কেউ যেন ইচ্ছে করে ছিঁড়েছে। পাতাগুলো কুচিকুচি করা। কয়েকটা টুকরো তুলে আমরা দেখলাম বিজ্ঞান ও দর্শনের বই।

কে এরকম করেছে? এ বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল? তাহলে জিনিসগুলো এমন টুকরো টুকরো করে ভাঙার কি দরকার ছিল? বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতিতে চোরেরা এসব আসবাবপত্র চুরি করে নিয়ে যেতে পারত—এমন করে নষ্ট করবে কেন? কেউ এসে লুকোনো কোনো সম্পদের খোঁজ করেছে? কিন্তু চেয়ার-টেবিল-খাট, এমনকি বইয়ের পাতায় কোন গুপ্ত সম্পদ থাকতে পারে? আমরা বিমূঢ় হয়ে বাড়িটার মধ্যে কিছুক্ষণ ঘুরলাম। কি এই পরিত্যক্ত বাড়ির গল্প? আমাদের কৌতূহল থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতেই চেপে কাছাকাছি জনপদ দেখেই আবার থামলাম। খোঁজ করতে লাগলাম বাড়িটা সম্পর্কে।

খুব বেশি কিছু জানা গেল না। শুনলাম একজন অধ্যাপক চাকরি থেকে রিটায়ার করে শান্তিতে থাকার জন্য ঐ বাড়িটা বানিয়েছিলেন। বেশ দয়ালু ও সজ্জন ছিলেন তিনি। স্থানীয় গরীব ছেলেদের সাহায্য করতেন। কয়েক বছর আগে হঠাৎ তিনি সব ছেড়েছুড়ে সন্ন্যাসী হয়ে কোথায় যেন চলে গেছেন। মানুষের সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া এমন কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়, কিন্তু তার আগে কোন সাংঘাতিক ক্রোধে ঐ লোকটি নিজের পাতানো সংসারের প্রতিটি জিনিস এমনভাবে ধ্বংস করে গেছেন তা কে বলবে?

বাজার ও নাগা সন্ন্যাসী

সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরুচ্ছি বাজারে যাবার জন্য, বাড়ির ঠিক সামনেই একজন লম্বা মতন সাধু আমার দিকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলল, এই বাচ্চা, শোন শোন—

থমকে দাঁড়ালাম দুটি কারণে। ধর্মে মতি না থাকলেও আমি পরিব্রাজক সাধু-সন্ন্যাসীদের পছন্দ করি। বাড়িঘর সংসারের কথা চিন্তা না করে যারা সারাজীবন ঘুরে বেড়ায় তাদের সঙ্গে হয়তো আমার অন্তরের কিছু যোগ আছে।

দ্বিতীয় কারণটি এই যে, বহুদিন আমাকে কেউ বাচ্চা বলে ডাকেনি। যখন বয়স খুব কম ছিল, তখন কেউ আমাকে বাচ্চা বললে চটে যেতাম। এখন বেশ একটা রোমাঞ্চের ভাব হয়।

সাধুটি বিরাট লম্বা-চওড়া, মাথায় জটা, মুখে পাউডারের মতন ছাই মেখে বেশ প্রসাধন করেছে, একটা আলখাল্লা দিয়ে শরীরটা ঢাকা। এক হাতে ত্রিশূল। অর্থাৎ বেশ খাঁটি সাধু সাধুই চেহারা বলতে হবে।

সাধুটি অত্যন্ত দুর্বোধ্য হিন্দীতে আমাকে যা বললেন, তার মর্মার্থ হলো এই যে, উনি হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় যাবেন। আমি যেন ওঁর ট্রেন ভাড়াটা দিয়ে দিই।

সাধু-সন্ন্যাসীদেরও ট্রেনভাড়া লাগে কিনা সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। আগে তো লাগত না বলেই জানতাম। কি জানি, এখন হয়তো সাধারণ যাত্রীদের কাছ থেকেই ভাড়া আদায় করা যায় না বলে রেলওয়ে বিভাগ নিরীহ সাধুদের কাছ থেকেই শুধু জোর জববদস্তি করে ভাড়া আদায় করতে শুরু করেছে।

আমি বললাম, সাধুজী, হরিদ্বারের কুম্ভমেলা দেখতে যাবার খুব ইচ্ছে ছিল আমারও। যদি ট্রেনভাড়া যোগাড় করতে পারতাম তাহলে তো আমি নিজেই যেতাম।

সাধুটি আমার বাংলা কথা একটি বর্ণও বুঝতে পারলেন না বোধহয়। আবার বললেন, আমি হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় যাব, তুমি আমায় ট্রেনভাড়া দাও। আমি একজন নাগা সন্ন্যাসী, গঙ্গাসাগর মেলায় এসেছিলাম, এখন আমাকে হরিদ্বারে যেতেই হবে।

তিনি তাঁর গায়ের আলখাল্লাটি খুলে সম্পূর্ণ শরীরটা আমাকে দেখালেন। তাঁর নাগাত্ব বিষয়ে সন্দেহ করার কোনো কারণই নেই।

যেহেতু পরিব্রাজক সাধুদের সম্পর্কে আমার দুর্বলতা আছে, তাই আমি পকেট থেকে দুটি টাকা বার করে তাঁর হাতে দিয়ে বললাম, বাবাজী, তোমার রেলভাড়ার পুরো টাকাটি তো আমাকে বিক্রি করলেও বেরুবে না। আমি এই সামান্য কিছু

দিলাম—বাকিটা তুমি আর সবার কাছ থেকে কিছু-কিছু করে যোগাড় করে নাও।

সাধু তাঁর ঝকঝকে দাঁতে হাসলেন এবং খপ করে আমার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরলেন।

ঘটনাটি ঘটছে আমারই বাড়ির সামনে। তিনতলার বারান্দা থেকে আমার মা এবং অন্যরা চেঁচামেচি করে আমাকে তক্ষুনি সাধুর হাত ছাড়িয়ে চলে যেতে বললেন। ওঁরা ভয় পেয়েছেন। ভয় পাবারই কথা। এখনকার দিনে বাজার খরচ থেকে দু'টাকা কম পড়া কি সোজা কথা। ওঁরা ভাবছেন আমি বুঝি সাধুটিকে বাকি টাকাটাও দিয়ে দেব—সেদিন বাড়িতে মাছ তরকারি কিছুই আসবে না।

আমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সাধু বাবাজীকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার?

সাধুজী আবার খটখটে হিন্দী ভাষায় যা বললেন, তাতে বুঝলাম যে, উনি আমাকে দেখেই বুঝেছিলেন, আমি রীতিমতন একটি পুণ্যাত্মা। আমার কপালে কিসের যেন একটা ছাপ আছে। সুতরাং উনি হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় গিয়ে আমার নামে একটা যজ্ঞ করবেন। তাতে আমাব জীবনের দারুণ উন্নতি হবে। সুতরাং এক সের খাঁটি ঘিয়ের দাম ওকে দেওয়া দরকার। খাঁটি ঘি বহুকাল চোখে দেখি নি, স্বাদও ভুলে গেছি। সেই খাঁটি ঘি আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করার প্রস্তাব একটা রীতিমত বীভৎস ব্যাপার। যাই হোক, সে কথা সাধুজীকে না বলে আমি সংক্ষেপে বললাম, আমার তো উন্নতির দরকার নেই।

সাধু হুংকার দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেয়া?

আমি একটু লঘু হয়ে গিয়ে বললাম, বিশ্বাস করুন স্যার, আমার জীবনের আর কোনো উন্নতির দরকার নেই। মাইরি বলছি, আমি বেশ আছি। উন্নতি হলেই আবার কত ঝামেলা হবে, ওসব দরকার নেই।

সাধু রক্তাক্ত চোখে আমার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তখনও আমার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরা, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার একটু হাসলেন।

নাগা সন্ন্যাসী হলেও তিনি এতদিনে জেনে গেছেন নিশ্চয়ই যে বাঙালিরা সাধারণত একটু অবিশ্বাসী ও ফোক্কড় প্রকৃতির হয়। এবং তিনিও এও জেনেছেন যে শহরের লোকেরা বিভূতি-টিভূতি অর্থাৎ ভেল্কিবাজি না দেখলে মুগ্ধ হয় না।

সাধুটি তাঁর মাথাটি ঝুঁকিয়ে এনে আমাকে বললেন, তাঁর মাথা থেকে কয়েকটা চুল টেনে ছিঁড়ে নিতে।

আমি রাজি হলাম না। যার সঙ্গে আমার কখনো ঝগড়া হয়নি, তার চুল ছিঁড়তে যাব কেন আমি। অনেক সময় নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হয় বটে। কিন্তু আমার চুলে তো সাধু-সন্ন্যাসীদের কোনো আগ্রহের কারণ থাকতে পারে না।

উনি নিজেই তখন নিজের মাথার কয়েক গাছা চুল ছিঁড়ে ফেললেন পটাং করে। তারপর আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, পাকড়ো।

আমি রাজি হলাম না। দুদিকে মাথা নাড়লাম।

উনি তখন নিজেই চুলগুলো গুলি পাকিয়ে ফেললেন এবং আমাকে বললেন, ফুঁ দাও। আমি ওঁর আঙুল দুটিতে ফুঁ দিলাম।

আমার নিশ্বাসে যে আগুন আছে তা আমি নিজেই জানতাম না। সত্যি, মানুষ নিজের সম্পর্কেও কত কিছু জানে না। আমি ফুঁ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চুলগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ঠিক পুড়ে যেতে দেখলাম না অবশ্য, দেখলাম চুলগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে, তার বদলে সন্ন্যাসীর হাতে রয়েছে খানিকটা ছাই। সেই ছাই দিয়ে আমার কপালে একটা টিপ পরিয়ে দিলেন।

ইদানীং ছাই-মাহাত্ম্য যে খুব চলছে, এই সন্ন্যাসীও তা জেনে গেছেন মনে হচ্ছে। তিনি একদৃষ্টে আমার দিকে তাকালেন। কিন্তু এই ছাইয়ের সঙ্গে ঘিয়ের দামের কোনো সম্পর্ক খুঁজে না পেয়ে আমি ভুরু নাচিয়ে বললাম, কি হলো?

সন্ন্যাসীর চোখে এবার যেন ফুটে উঠল ভর্ৎসনা। তিনি ফের বললেন, তোমার উন্নতির জন্য আমি যজ্ঞ করতে চাই। আমিও আবার বললাম, আমার উন্নতির কোনো দরকারই যে নেই।

তিনি তখন আবার দু'হাত উঁচু করলেন, আলখাল্লাটি সরিয়ে পুনরায় নিজের শরীরটা দেখিয়ে বললেন, নাগা সন্ন্যাসী।

অর্থাৎ তিনি যেন বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, তাঁর শরীরের লুকোনো কিছু নেই। তারপর দুটো আঙুলে নস্যি ধরার ভঙ্গিতে টিপে আমার কাছে নিয়ে এলেন, সেখান থেকে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। একটু আগে যেখানে ছাই ছিল, এখন সেখান থেকে জল পড়ছে—এটা যে একটা চমকপ্রদ ব্যাপার তা স্বীকার করতেই হবে।

এবার সাধুজী আমার চোখের দিকে তাকাতেই আমি বললাম, বাঃ।

শুনেছি বিভূতি বা সিদ্ধাই বারবার প্রয়োগ করলে সাধুদের আয়ু কমে যায়। এই স্বাস্থ্যবান সাধুটির কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছে আমার নেই। পাছে উনি আরো চমকপ্রদ কিছু আমাকে দেখাতে চান, তাই আমি বললাম, আর থাক, খুব ভালো হয়েছে।

কেউ একে বলবেন অলৌকিক ক্ষমতা, কেউ বলবেন ম্যাজিক। আমি ওসব সাতে-পাঁচে নেই। তবে, সব কাজেরই একটা পারিশ্রমিক দেওয়ায় আমি বিশ্বাস করি। এই যে সাধুটি আমাকে এই সব দেখালেন, এর একটা মূল্য পাওয়া উচিত। আমি বাজার খরচের অবশিষ্ট দুটি টাকা সাধুটিকে দিয়ে বললাম, সাধুজী, গোলপার্কে

একটা দোকানে ভালো জিলিপি পাওয়া যায়—এই টাকা নিন, আপনি জিলিপি সেবা করবেন।

আমি জানি, সাধুরা যেসব বায়বীয় পদার্থ অহরহ পান করেন, তারপর একটু মিষ্টি খাওয়া খুব দরকার।

যাই হোক, তারপর শূন্য থলি নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসার পর সে কি চ্যাচামেচি। সবাই আমাকে বোকা, গাধা, ইস্টুপিড—এই সব বিশেষণে ভূষিত করতে লাগলেন। আমার ছোড়দা আবার কট্টর নাস্তিক, সে বলল, ইডিয়েট, তুই সামান্য ম্যাজিক দেখেই টাকাটা দিয়ে এলি।

আমি মনে মনে বললাম, একদিন বাজার না হলে কি ক্ষতি হয়। তার বদলে ম্যাজিকেই বা মন্দ কি। এই বাজারেও যে আমরা দিনের পর দিন সংসার চালাচ্ছি—সেটাও তো একটা ম্যাজিক বলতে গেলে।

আত্মহত্যা ও কবিতা

চিরঞ্জীবের বাড়িতে গেলে বই দেখেই অনেক সময় কেটে যায়। নিয়মিত বই কেনে চিরঞ্জীব, যত্ন করে সাজিয়ে রাখে, আস্তে আস্তে নিজের বাড়িতে একটা লাইব্রেরি বানিয়ে তুলছে। এত টাটকা নতুন বই শুধু ওর বাড়িতেই দেখেছি। যা মাইনে পায়, তার অর্দ্ধেকের বেশি টাকাই ও বই কেনার জন্য খরচ করে। সিগারেট খায় না, অন্য কোনো নেশা নেই, এমনকি প্রেমও করে না।

আমরা এই নিয়ে কখনো কখনো ঠাট্টা করেছি ওকে। বলেছি, অত তোর বই-প্রেম যে তুই মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখারও সময় পাস না? তুই বিয়ে করলে তোর বউ যে এই বইগুলোকেই সতীন মনে করবে।

চিরঞ্জীব লাজুক ধরনের ছেলে, এই সব কথার কোনো উত্তর দেয় না। মেয়েদের প্রতি সত্যিই যেন ওর কোনো আগ্রহ নেই। এটা একটু ভয়ের ব্যাপার। অনেকের ধারণা, বেশি মেয়েদের সঙ্গে মিশলে ছেলেদের চরিত্র খারাপ হয়। কিন্তু আমি দেখেছি আঠাশ তিরিশ বছর বয়সেও যে পুরুষ একটিও মেয়ের সঙ্গে মেশেনি, তারই চরিত্র খারাপ হয় বেশি। সে বাতিকগ্রস্ত কিংবা খিটখিটে হয়, স্বার্থপর হয় এবং ক্রমশই বোকা বোকা হয়ে যায়।

চিরঞ্জীবের সেই সব দোষ এখনো অবশ্য দেখা দেয়নি। তবে, বই সম্পর্কে ওর বড়োই বাড়াবাড়ি। একটি বইও কারুকে নিয়ে যেতে দেবে না বাড়ি থেকে। কতদিন কত বই দেখে লোভ হয়েছে, কিন্তু চিরঞ্জীব এই ব্যাপারে খুব কড়া। ও

বলেছে, আমার এখানে বসে যতক্ষণ ইচ্ছে পড়ো, কিন্তু বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবে না। অনেকে বই ফেরত দিতে ভুলে যায়, বার বার চাওয়া যায় না, ফেরত পেলেও মলাট আস্ত থাকে না।

সন্ধেবেলা হাতে কিছু কাজ না থাকলে আমি চিরঞ্জীবের বাড়িতে চলে যাই। আর কোনো বন্ধুবান্ধবকে সন্ধের পর বাড়িতে না পাওয়া গেলেও চিরঞ্জীবকে পাওয়া যাবেই। এবং ও বেশ বন্ধুবৎসল।

ইদানীং পর পর দু'দিন চিরঞ্জীবকে সন্ধের পর বাড়িতে পাইনি। একটু খটকা লেগেছিল। তারপর একদিন সন্ধেবেলা দেখতে পেলাম রাজভবনের পাশ দিয়ে চিরঞ্জীব একটি মেয়ের সঙ্গে নিবিষ্টভাবে কথা বলতে বলতে হেঁটে যাচ্ছে। দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। এটা একটা ভালো লক্ষণ--দিনরাত বই নিয়ে মশগুল হয়ে থাকা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। আমি আর ওকে বিরক্ত করলাম না।

দিন সাতেক বাদে আর একটি অবাক ব্যাপার ঘটল। বেশি রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখলাম, চিরঞ্জীব আমার জন্য তিনখানা বই রেখে গেছে। ওর নিজের সংগ্রহের বই, বেশ দামী। কিছুদিন আগে এই তিনখানা বই সম্পর্কে আমি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম। চিরঞ্জীব কারুকে বই নিতে দেয় না, আজ নিজে থেকে বাড়িতে এসে বইগুলো দিয়ে গেল কেন? এই কি প্রথম প্রেমের পুলক।

পুরো ব্যাপারটা জানতে পারলাম পরে। সেদিন চিরঞ্জীব ট্যাক্সি নিয়ে প্রত্যেক বন্ধুর বাড়ি ঘুরে ঘুরে ঐরকমভাবে তিন চারখানা করে বই রেখে গেছে। বন্ধুরা সবাই বিস্মিত হয়েছে। কিন্তু কেউই খুব বেশি মাথা ঘামায়নি।

শুধু বই নয়, চিরঞ্জীব তার অনেক প্রিয় জিনিসপত্রও বিলিয়ে দিয়েছে অনেককে। তার বদলে সংগ্রহ করেছে পঞ্চাশটা ঘুমের বড়ি। রাত্রিবেলা সারা বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পর চিরঞ্জীব নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রথমে লিখেছে একটা চিঠি। 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমি ভালোবাসা পাইনি বলেই চলে যাচ্ছি এ পৃথিবী থেকে।'

চিঠিটা টেবিলে চাপা দিয়ে শুয়ে পড়েছে বিছানায়। পাশে জলের জাগ। একটার পর একটা ঘুমের বড়ি মুখে দিয়েছে, চোখের সামনে খোলা জীবনানন্দ দাশের কবিতার বই। কবিতা পড়তে পড়তে মরে যাওয়াই ওর শেষ সাধ।

উনত্রিশ বছর বয়েসে প্রথম একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয় চিরঞ্জীবের। পরিচয় মানেই প্রেম। কিন্তু প্রেম সম্পর্কে তার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। চাপা স্বভাব বলে বন্ধুদের কাছেও কিছু বলেনি বা পরামর্শ নেয়নি। তার ফলে যা হবার তাই হয়েছে। *মেয়েটির প্রত্যাখ্যান চিরঞ্জীবের জগৎ-সংসার শূন্য হয়ে গেছে।*

কবিতার বইটি পড়তে পড়তে চিরঞ্জীব এক জায়গায় থমকে যায়। ঠিক যেন

তার নিজেরই মনের কথা।

শেষ ট্রাম মুছে গেছে, শেষ জব্দ, কলকাতা এখন
জীবনের জগতের প্রকৃতির অন্তিম নিশীথ ;
চারিদিকে ঘর বাড়ি পোড়ো-সাঁকো সমাধির ভিড় ;
সে অনেক ক্লান্তি ক্ষয় অবিনশ্বর পথে ফিরে
যেন ঢের মহাসাগরের থেকে এসেছে নারীর
পুরোনো হৃদয় নব নিবিড় শরীরে।

চিরঞ্জীবের শরীরটা শিউরে ওঠে। একটি মেয়ের সামান্য একটা মুখের কথায় সে মরতে যাচ্ছে? মানুষের জীবন কি নক্ষত্রের মতন?

তখন চিরঞ্জীবের খুব বাঁচতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে সাতাশটা ঘুমের বড়ি খেয়ে ফেলেছে। বাকি বড়িগুলো বাথরুমে গিয়ে ফেলে দেবার জন্য সে বিছানা ছেড়ে উঠল কিন্তু যেতে পারল না, ঝপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

পরদিন বেলা দশটায় যখন দরজা ভেঙে উদ্ধার করা হলো তাকে তখনও তার বুক ধুকপুক করছে। হাসপাতালে নিয়ে স্টমাক পাম্প করার পর কোনোক্রমে বেঁচে গেল চিরঞ্জীব।

চিরঞ্জীবের আত্মহত্যার চেষ্টার খবর শুনে আমরা বেশ বিরক্ত হয়েছিলাম। এরকম আধখ্যাচড়াভাবে কোনো কাজই ভালো লাগে না। যাই হোক, ও আবার বেঁচে ওঠার পর আমরা সমস্যায় পড়লাম। ওর বইগুলো কি ওকে আবার ফেরত দিয়ে আসা উচিত? উপহার কি ফেরত দেওয়া যায়? অথচ বইগুলো ওর কত প্রিয় তাও আমরা জানি।

একদিন হাতে করে নিয়ে গেলাম বইগুলো ওর বাড়িতে। মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরে এসে চিরঞ্জীব আরো লাজুক হয়ে গেছে। মাথা নিচু করে আড়ষ্ট গলায় বললে, না না ওগুলো আর দিতে হবে না আমাকে। আমি আবার একটা একটা করে সব বই কিনব। সেইটাই হবে আমার বেঁচে থাকার কারণ।

More Books @ BDeBooks.Com

BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com